ভারত ও চীন

5334

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫৭ ॥

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ও লোকশিক্ষাগ্রন্থমালা প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতী যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধনের এই কর্তব্য পালনে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ হইতে ১৩৫৬ সালে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ৭৮ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভারত ও চীন

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৫৭ কার্তিক

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

৩. ১+২. ১

ভূমিকা

খৃস্টীয় প্রথম শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত ভারত ও চীনদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। পৃথিবীর অন্য কোনো দুটি দেশের মধ্যে এত দৃঢ় সাংস্কৃতিক যোগ দেখা যায় না। সেই ইতিবৃত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এই পুস্তিকায় পাওয়া যাবে।

এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত 'ভারত ও মধ্য এশিয়া' এবং 'ভারত ও ইন্দোচীন' নামক আমার আর দুখানি বইয়ে বৃহত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যাবে। বিষয়বস্তুর মধ্যে যোগসূত্র থাকার জন্য সে দুই বই থেকে কিছু পুনরুক্তি করা হয়েছে। ধারাবাহিকতার উপর দৃষ্টি রাখবার জন্যই এই সামান্য পুনরুক্তির প্রয়োজন হয়েছে।

ভারত ও চীনের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে আমার INDIA AND CHINA নামক ইংরেজি পুস্তকে।

শান্তিনিকেতন

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

মৈত্রীর সূত্রপাত

প্রাচীনকালে চীনদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল সে কথা নূতন করে বলবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেই যোগাযোগের সঠিক ইতিহাস এখনো লেখা হয় নি। সে ইতিহাস ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্তে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে বলে তা অন্তত সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের প্রত্যেকেরই জানা উচিত। কারণ ইতিহাস জাতির পুনর্গঠনে এবং ছিন্ন যোগসূত্রকে গ্রথিত করবার ব্যাপারে যে অনেক সহায়তা করে তা অস্বীকার করবার উপায় নাই।

চীনদেশের 'চীন' নাম ভারতবর্ষই বহির্জগতের নিকট প্রথম প্রচার করে। চীনারা নিজেদের দেশকে এখনো অন্য নামে অভিহিত করে, প্রাচীনকালেও তাই করত। খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে চীন দেশে যে রাজবংশ রাজত্ব করত তার নাম ছিল 'চীন' আর চীনাদের প্রাচীন প্রথানুসারে সেই রাজবংশের রাজত্বকালে তাদের দেশের নাম দেওয়া হয় 'চীনদেশ'। এর অব্যবহিত পরে নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় চীনারা দেশের নাম পরিবর্তন করল বটে, কিন্তু ভারতীয়েরা সে দেশের 'চীনদেশ' আখ্যাই রাখল এবং বাইরে সে নাম প্রচার করল। ঐ যুগের গ্রীক সাহিত্যেও সেইজন্য চীনদেশ Sinae, Thinae প্রভৃতি নামে অভিহিত হল।

চীনদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে সে দেশের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীকে 'মান্দারিন' নামে অভিহিত করা হত এবং রাজধানী পেকিং অঞ্চলের কথ্য ভাষারও আখ্যা ছিল 'মান্দারিন্'। এই মান্দারিন্ শব্দও সংস্কৃত মন্ত্রী শব্দের পরিবর্তিত রূপ। এ আখ্যা প্রথম প্রচার করে পোর্তুগীজ নাবিক ও বণিক সম্প্রদায়।

চীনদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে সংযোগ তার ইতিহাস প্রাচীন চীনাসাহিত্য হতেই উদ্ধার করতে হয়। ভারতীয় সাহিত্যে সে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নাই বললেই চলে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'চীনসী' 'চীনপট্ট' প্রভৃতির উল্লেখ আছে এবং মহাভারতেও চীনাদের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ দুই গ্রন্থের রচনাকাল এখনও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নি।

প্রাচীন চীনাসাহিত্যে ধারাবাহিকভাবে এ ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। দুই-একটি অলীক কিম্বদন্তীও সে ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশলাভ করেছে। এই কিম্বদন্তী হচ্ছে যে, মৌর্যবংশীয় রাজা অশোকের সময় ভারতবর্ষ হতে সতেরো জন বৌদ্ধভিক্ষু চীনদেশে যান। অপরিচিত বিদেশী বলে এই ভিক্ষুরা প্রথমে কারারুদ্ধ হন, পরে মুক্তি পান। আর একটি প্রবাদ হচ্ছে যে, খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে চীন সেনাপতি 'হূণ'দেশ হতে যুদ্ধ করে ফিরবার সময় স্বর্ণময়ী মূর্তি সংগ্রহ করে আনেন, এ মূর্তি বুদ্ধদেবের। কিন্তু এসব প্রবাদ যে অমূলক তা প্রাচীন চীনা ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করে গেছেন।

চীনদেশের সঙ্গে হূণজাতির বহুকাল ধরে বিবাদ চলছিল। হূণেরা চীনদেশের সমস্ত উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অধিকার করে চীনাদের উৎপীড়িত করত। হূণদের এই গতি রোধ করবার জন্যই বিখ্যাত চীনা প্রাচীর নির্মিত হয়। কিন্তু এতেও হূণদের বিধ্বস্ত করা যায় নি। খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের তৃতীয় পাদে চীনদেশের সম্রাট বুঝতে পারলেন যে, মধ্য এশিয়ার নানা জাতির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে পারলে দুই দিক থেকে হূণজাতিকে নিষ্পেষিত করা সম্ভব হবে। মধ্য এশিয়ার খোটান কাশগর সমরকন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে শকজাতি এবং তুখারজাতি বসবাস করত। সুতরাং খৃস্টপূর্ব ১৩৬ সালে চীনসম্রাট চাং-খিয়েন নামক এক দূতকে ঐ সকল জাতির নিকট প্রেরণ করলেন। চাং-খিয়েন

প্রত্যন্তদেশ অতিক্রম করতেই হূণদের হাতে বন্দী হন এবং প্রায় দশ বৎসর বন্দী থাকার পর তুখারদেশে এসে উপনীত হন। এ জাতির রাজধানী তখন পামীরের অপর পারে প্রাচীন বক্ষু বা আমুদরিয়া নদীর তীরে অবস্থিত। চাং-খিয়েন শক ও তুখারদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করলেন বটে, কিন্তু তারা হূণদের সঙ্গে বিবাদ করতে রাজী হল না।

চাং-খিয়েন তুখারদেশের রাজধানীতে চীনদেশের পণ্যদ্রব্য দেখতে পেলেন, আর লোকমুখে শুনলেন যে, এই সব পণ্য ভারতীয় সার্থবাহেরা চীনদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত হতে ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছে। চাং-খিয়েন স্বদেশে ফিরেই চীন-সম্রাটকে জানালেন যে, ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিত এবং ভারতবর্ষে পৌঁছবার পথ দুটি, একটি মধ্য এশিয়া হয়ে পামীর ও হিন্দুকুশ অতিক্রম করে, অন্যটি চীনদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ইউ-নান প্রদেশের মধ্য দিয়ে।

চাং-কিয়েনের এই কথা হতে বেশ বোঝা যায় যে, চীনসাম্রাজ্যের ইউ-নান প্রদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের বহু প্রাচীনকাল হতেই সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। চাং-খিয়েনের সময় অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের তৃতীয় পাদের পূর্বেই যে তা ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নাই। এ পথের এই প্রাচীন উল্লেখ পাই বটে, কিন্তু তার বিস্তৃত বর্ণনা পাই পরবর্তীকালের চীনাসাহিত্যে।—এ পথ আরম্ভ হয়েছিল ইউ-নান প্রদেশের রাজধানী ইউ-নান-ফু (বর্তমান কুন্‌-মিং শহর হতে) আর পার্বত্যদেশের মধ্য দিয়ে বর্তমান শান্‌রাজ্য হয়ে ব্রহ্মদেশের উত্তরাঞ্চলে ভামোর নিকটবর্তী স্থানে এসে পৌঁছেছিল। ব্রহ্মদেশের এ অঞ্চল হতে স্থলপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার দুটি উপায় ছিল, একটি আসামের উত্তর-পূর্বাঞ্চল হয়ে, অন্যটি আরাকান ও মণিপুর হয়ে। উভয় পথ শেষ হয়েছিল মগধরাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে।

খৃস্টপূর্ব প্রথম শতকে চীনারা হূণদের বিধ্বস্ত করে মধ্য এশিয়া

দিয়ে যাতায়াতের পথ হস্তগত করল এবং সেই পথেই অবিলম্বে ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হল। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল তখন কুশান রাজাদের অধিকারে এসেছে। মধ্য এশিয়ার পথে যাতায়াত সম্ভব হতেই কুশান-রাজারা চীনসম্রাটের নিকট দূত পাঠালেন এবং সেই সঙ্গে উপহার পাঠালেন কতকগুলি বৌদ্ধশাস্ত্রের পুঁথি। কুশান-রাজারা ইতিপূর্বেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। খৃস্টপূর্ব দুই সালে এই দূত চীনদেশের রাজধানীতে এসে উপনীত হলেন। এর কিছু পূর্বেই ভারতবর্ষের পূর্বপ্রদেশ হতে বৌদ্ধ ধর্মযাজকেরা ইউ-নান্ ও নিকটবর্তী প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেন। ফলে এই ধর্মের পক্ষ সমর্থন করে একজন চীনা-পণ্ডিত যে গ্রন্থ রচনা করেন তা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই পণ্ডিতের নাম মউ-জু। তিনি যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, চীনাদের প্রাচীনধর্ম হতে বৌদ্ধধর্ম অনেক উন্নত। খুব সম্ভব এই চীনাপণ্ডিতের প্রভাবেই কয়েকজন রাজপুরুষ অবিলম্বে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

খৃস্টীয় প্রথম শতকের তৃতীয়পাদে চীনদেশের সম্রাটও বৌদ্ধধর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হন। ঐ সময় কুশানদের রাজধানী হতে কাশ্যপ-মাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন নামক দুইজন ভারতীয় ভিক্ষু পুঁথিপত্র নিয়ে চীনদেশের রাজধানীতে এসে উপনীত হন। প্রবাদ যে, তাঁরা একটি সাদা ঘোড়ার পিঠে পুঁথিপত্র বোঝাই করে নিয়ে চীনে আসেন। চীন-সম্রাট সসম্মানে এঁদের রাজধানীতে স্থান দেন এবং ৬৮ খৃস্টাব্দে চীনদেশে প্রথম বৌদ্ধমন্দির স্থাপিত হয়। পুঁথিবাহী শ্বেত অশ্বের স্মৃতিরক্ষার্থে এই মন্দিরের নাম দেওয়া হয়—'পো-মা-স' বা 'শ্বেত-অশ্ব-বিহার।' এই বিহার বৌদ্ধ-চীনে ছিল সব চাইতে প্রধান প্রতিষ্ঠান। কাশ্যপ-মাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন যে সব পুঁথি পত্র নিয়ে এসেছিলেন তা চীনাভাষায় অনূদিত হয়। এই অনূদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে একখানি এখনো চীনা-বৌদ্ধসাহিত্যে সংরক্ষিত

রয়েছে। এ গ্রন্থের নাম 'দ্বিচত্বারিংশৎ-বস্তুসূত্র'। সে গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের মূল সূত্রগুলি ও সংঘ নিয়ন্ত্রিত করবার প্রধান নিয়মাবলী সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

চীনদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের এই প্রথম সংযোগ দৃঢ়তর হয় বিদেশী বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রচেষ্টায়। কাশ্যপ-মাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন ভারতীয় হলেও কুশানরাজ্য হতে চীনদেশে যান এবং খুব সম্ভব বৌদ্ধধর্মাবলম্বী-কুশানদের প্ররোচনায়। কিন্তু তাঁদের পরেই যে বৌদ্ধভিক্ষু চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি ছিলেন জাতিতে পারসিক। চীনা ভাষায় তাঁর নাম 'আন্-শে-কাও'। 'শে-কাও' সংস্কৃত 'লোকোত্তম' শব্দের অনুবাদ। আন্ প্রাচীন উচ্চারণ পদ্ধতির নিয়মানুসারে 'আর-সাক্' শব্দের খণ্ডিতাংশ। এ হতে বোঝা যায় যে, ভিক্ষু লোকোত্তম ছিলেন পারস্যের 'আরসকিদীয়' রাজবংশের রাজকুমার।

প্রাচীন চীনা সাহিত্যে ভিক্ষু লোকোত্তমের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে তা হতেও বোঝা যায় যে তিনি ছিলেন পারস্যদেশের 'আরসকিদীয়' রাজবংশের কুমার। তিনি অল্প বয়সেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং রাজপদ পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। নানা দেশ পর্যটন করে তিনি ১৪৮ খৃস্টাব্দে চীনদেশের রাজধানীতে উপনীত হন। তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যয়নে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্রের অন্যান্য ভাষাও জানতেন এ অনুমান করা অসংগত নয়। তিনি ১৬৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং এই বিশবৎসর তিনি চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকার্যেই আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। এই বিশবৎসরের মধ্যে তিনি ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্র হতে প্রায় ১৭৯ খানি গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে এখনো ৫৫ খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। দু-একখানি প্রধান গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে—'মহানপান-ধ্যান-সূত্র', 'মার্গ-ভূমিসূত্র'

'সামন্তধর্মার্থস্থত্র' ইত্যাদি। এই স্থত্রগুলি বেশীর ভাগ বৌদ্ধ স্থত্রপিটকের অন্তর্গত। সংস্কৃত ভাষায় যে প্রাচীন স্থত্রপিটক ছিল তা অধুনা লুপ্ত, ভিক্ষু লোকোত্তম ও পরবর্তীকালের অন্যান্য ভিক্ষুদের চীনা অনুবাদ হতেই এই লুপ্ত স্থত্রপিটকের অস্তিত্ব জানতে পারা যায় এবং সেই অনুবাদের সাহায্যেই প্রাচীন স্থত্রপিটক উদ্ধার করা যেতে পারে। যা হোক, এই পারসিক বৌদ্ধভিক্ষু লোকোত্তমের চেষ্টাতেই চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম স্থপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর অনূদিত এই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ হতেই চীনারা প্রথম বৌদ্ধধর্মের সম্যক পরিচয় পায় ও সে ধর্মে দীক্ষালাভ করে।

এর কিছুদিন পরেই আর একজন বৌদ্ধভিক্ষু চীনদেশে যান, তাঁর নাম লোকক্ষেম। লোকক্ষেম ছিলেন তুখারদেশের লোক। বক্ষু (আমুদরিয়া) নদী পামীর হতে নির্গত হয়েই তার শাখাপ্রশাখা দিয়ে যে দেশকে অভিষিক্ত করেছে সেই দেশের প্রাচীন নামই হচ্ছে 'তুখার দেশ'। সংস্কৃত সাহিত্যে এ দেশের নাম দেওয়া হয়েছে 'তুষার', তার কারণ 'ষ'এর সঠিক উচ্চারণ ছিল—'খ'এর মতো। কুশানজাতি এই তুখার জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে দেশে খৃঃ পূঃ প্রথম শতকেই বৌদ্ধধর্ম প্রবেশলাভ করেছিল, আর লোকক্ষেমের সময়ে অর্থাৎ খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে বৌদ্ধধর্ম ছিল সে দেশের প্রধান ধর্ম। লোকক্ষেম ভিক্ষু লোকোত্তমের কিছু পরেই চীনদেশের রাজধানীতে উপনীত হন এবং ১৮৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন ও বৌদ্ধশাস্ত্র চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি ২৩ খানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন, এই সব গ্রন্থের মধ্যে ১২ খানি এখনো পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে 'প্রজ্ঞাপারমিতা', 'কাশ্যপপরিবর্ত' প্রভৃতি মহাযান গ্রন্থ এবং সংস্কৃত স্থত্রপিটকের অন্তর্গত নানা হীনযান স্থত্রও আছে। লোকক্ষেমের এই অনুবাদকার্যে সহায়তা করেছিলেন একজন ভারতীয় ভিক্ষু। তাঁর প্রকৃত

নাম এখনো উদ্ধার করা যায় নি। চীনাভাষায় সে নাম রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'ফো-শো'। এই ভারতীয় ভিক্ষু ঠিক কোন সময়ে চীনদেশে গিয়েছিলেন তা জানা যায় না, তবে তিনি যে লোকক্ষেমকে সহায়তা করেছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 'ফো-শো' অনুমান ১৬৮ খৃস্টাব্দ হতে ১৮৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে চীনদেশে ছিলেন।—

এই যুগে চীনদেশে আর যেসব বৌদ্ধভিক্ষু গিয়েছিলেন ও বৌদ্ধশাস্ত্র চীনাভাষায় অনুবাদ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন পারসিক, একজন তুখার ও দু'জন সুগ্দীয় পণ্ডিতের নাম পাই। বৌদ্ধধর্ম এ যুগে পারস্যদেশে অজ্ঞাত ছিল না, সেকথা পূর্বেই বলেছি। 'আন্-হিউয়ান' নামক আর একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত ১৮১ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে উপনীত হন। তিনি ছিলেন গৃহী বৌদ্ধ। চীনদেশের রাজধানীতে অবস্থানকালে তিনি দুইখানি বৌদ্ধগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন— 'উগ্রপরিপৃচ্ছা' ও 'দ্বাদশবিধানসূত্র'। এ গ্রন্থ দুখানি এখনো পাওয়া যায়।

সুগ্দ হচ্ছে প্রাচীন পারস্যরাজ্যের পশ্চিমাংশ, বর্তমান সমরকন্দ অঞ্চলের প্রাচীন নাম। সুগ্দজাতি ইরাণী জাতির একটি শাখা। সে দেশে বৌদ্ধধর্ম খৃস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তার প্রমাণ মধ্য এশিয়ার নানা স্থান হতে যে পুঁথিপত্র সংগৃহীত হয়েছে তাতেই পাওয়া গিয়েছে। সুগ্দ দেশের ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র অনূদিত হয়েছিল। সে সমস্ত অনূদিত গ্রন্থের খণ্ডিতাংশ মধ্য এশিয়ার নানা স্থানে পাওয়া গিয়েছে। সুগ্দীয় জাতি বাণিজ্য ব্যপদেশে মধ্য এশিয়ার নানা স্থানে উপনিবেশ বিস্তার করেছিল এবং সেই সূত্রে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কার্যে যথেষ্ট সহায়তাও করেছিল।

চীনাসাহিত্যে সুগ্দীয় দেশ 'খাং'দেশ নামে উল্লিখিত হয়েছে এবং সেই কারণে সুগ্দীয় ভিক্ষুদের নামের পূর্বে এই 'খাং' শব্দ জুড়ে

দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত সংস্কৃত ভাষায় এ নাম 'কঙ্ক' রূপ নিয়েছিল। যে দু জন স্থগদীয় ভিক্ষু চীনদেশে গিয়েছিলেন তাঁদের নাম হচ্ছে—'খাং কিউ' এবং 'খাং মোংসিয়াং'। 'খাং কিউ' ১৮৭ এবং 'মোংসিয়াং' ১৯৯ খৃস্টাব্দে চীনদেশের রাজধানীতে উপনীত হন। তাঁরা তাঁদের শেষজীবন চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে অতিবাহিত করেন এবং নানা বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। 'মোং সিয়াং'—এর অনূদিত ৪ খানি গ্রন্থ এখনো পাওয়া যায়।

৬৮ হতে ২২০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত চীনদেশে যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল তার নাম 'হান্' বংশ (দ্বিতীয় শাখা)। 'হান্' বংশের প্রথম শাখার রাজ্যকালে চাং-খিয়েন মধ্য এশিয়ায় প্রেরিত হন ও পরে ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবার জন্য—মধ্য এশিয়ায় পথঘাট খোলা হয়। এই বংশের দ্বিতীয় শাখার রাজ্যকালের প্রথম থেকেই ভারতীয়-বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে প্রচারিত হয় এবং পারসিক, তুখার ও স্থগদীয় বৌদ্ধ-পণ্ডিতদের চেষ্টায় সে ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। চীনাভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্রের যে অসংখ্য অনুবাদ পাওয়া যায় তার মূলেও এই বিদেশী পণ্ডিতদের প্রচেষ্টা। ভারতবর্ষ বর্তমান কালে এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য জাতির সহায়তা হতে বঞ্চিত হয়েছে বটে, কিন্তু প্রাচীনকালে যে সে মহাদেশের বহু জাতি ভারতীয় সভ্যতার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সে সভ্যতা দেশ বিদেশে প্রচার করেছিল তার প্রমাণ চীনা-বৌদ্ধসাহিত্য হতেই পাওয়া যায়।

গুপ্তযুগে চীনদেশে ভারতীয় পণ্ডিত

খৃস্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে চীনদেশের সঙ্গে ভারতের সুদৃঢ় যোগসূত্র স্থাপিত হবার পর ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষুরা ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি চীনদেশে বহন করে নিয়ে যেতে আরম্ভ করেন। পূর্বেই বলেছি এই কাজে প্রথম পথপ্রদর্শক হন বিদেশী ভিক্ষুরা; মধ্য এশিয়ার নানা দেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতেরাই একাজে প্রথম আত্মনিয়োগ করেন। এর কিছুকাল পরেই ভারতবর্ষ থেকে দলে দলে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ মধ্য এশিয়ার স্থলপথে ও বৃহত্তর ভারতের জলপথে চীনদেশে যেতে আরম্ভ করেন। চীনাভাষায় তাঁদের অনূদিত বহু গ্রন্থ সংরক্ষিত হয়েছে।

খৃস্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগে চীনদেশের বৌদ্ধভিক্ষু ফা-হিয়েন ভারতে আসেন। স্থলপথে তিনি মধ্য এশিয়ার নানা দেশ অতিক্রম করে ভারতবর্ষে উপনীত হন। তিনি উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত প্রধান বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠানেই কিছুকাল অতিবাহিত করেন ও সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের আচার্যদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করেন। তিনি সিংহল হতে জলপথে চীন-দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফা-হিয়েনের এই ভারত ভ্রমণও যথেষ্ট পরি-মাণে ভারতীয় পণ্ডিতদের চীনদেশের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। ফা-হিয়েনের প্রায় একশো বছর পরে আর একজন চীনা-পরিব্রাজক ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁর নাম সোং-ইউন। তিনি কাশ্মীর ও গন্ধার দেশের নানা স্থান ভ্রমণ করে চীনদেশে ফিরে যান। তাঁর সঙ্গেও ঐ সব অঞ্চলের বৌদ্ধ-পণ্ডিতদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। খুব সম্ভব এঁরাই খ্যাতনামা ভারতীয় পণ্ডিতদের চীনদেশে যাবার জন্য উৎসাহিত করেন।

এযুগে কাশ্মীরের বৌদ্ধ-পণ্ডিতগণই চীনযাত্রী ভারতীয় ভিক্ষুদের পথপ্রদর্শক ছিলেন। কাশ্মীর ছিল সর্বাস্তিবাদ নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের

প্রধান কেন্দ্র। এই সম্প্রদায়ের সাহিত্য রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায়। কাশ্মীরবাসী পণ্ডিতগণ এই সাহিত্যের প্রথম প্রচলন করেন মধ্য এশিয়ার নানা দেশে, তারপর চীনদেশে। চীনভাষায় এই সাহিত্যের অনুবাদও হয় তাঁদেরই চেষ্টায়। কাশ্মীর হতে যাঁরা এযুগে চীনদেশে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সংঘভূতি, গৌতম সংঘদেব, বিমালক্ষ, বুদ্ধভদ্র, ধর্মযশস্, পুণ্যত্রাত ও গুণবর্মণ।

সংঘভূতি মধ্য এশিয়া অতিক্রম করে ৩৮১ খৃস্টাব্দে চীনদেশের রাজধানীতে উপনীত হন। তিনি অন্যান্য বৌদ্ধভিক্ষুদের সহায়তায় চীনা ভাষায় নানা বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে সর্বাস্তিবাদের অভিধর্মপিটকের বিরাট টীকা 'বিভাষাশাস্ত্র' প্রধান। এই অনুবাদ শেষ করতে তিন বৎসর লেগেছিল। এই অনুবাদকার্যে শুধু যে ভারতীয় পণ্ডিতেরাই অংশ গ্রহণ করেছিলেন তা নয়, সংস্কৃতজ্ঞ চীনা পণ্ডিতেরাও তাতে সহায়তা করেছিলেন।

এই যুগে সংস্কৃতগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করবার একটি বিশেষ প্রণালী অনুসৃত হত। চীনদেশে সদ্য আগত পণ্ডিতেরা চীনাভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ না করেও দোভাষীর সাহায্যে নানা গ্রন্থের অনুবাদ করতেন। এই সব দোভাষীর মধ্যে থাকতেন মধ্য এশিয়ার নানা বৌদ্ধপণ্ডিত ও সংস্কৃতজ্ঞ চীনা বৌদ্ধ-পণ্ডিত। অনুবাদ-সভায় প্রধান অনুবাদক সংস্কৃত-গ্রন্থ পাঠ করতেন ও তার ব্যাখ্যা করতেন। বিদেশী দোভাষী চীনা-ভাষায় তা মুখে মুখে অনুবাদ করতেন। চীনা দোভাষী তা শুদ্ধ চীনা ভাষায় লিখে নিতেন। আর একজন তার অর্থবোধ হয় কিনা তার বিচার করতেন এবং অবোধ্য স্থানগুলির পুনরালোচনা করতেন। এই ভাবে অনুবাদকার্য দ্রুত অগ্রসর হত এবং বহু সংস্কৃতগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব হত। সংস্কৃত হতে চীনাভাষায় অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা তিন হাজারেরও উপর। অনেক অনুবাদ নষ্ট হয়েও গিয়েছে।

কাশ্মীর হতে চীনদেশে আর একজন পণ্ডিত আসেন—গৌতম সংঘদেব। তিনে চীনদেশের রাজধানীতে ৩৮৪ খৃস্টাব্দে উপনীত হন। তিনি ঐ দেশে অনেকদিন অতিবাহিত করেন এবং চীনদেশের উত্তর ও দক্ষিণাংশে বৌদ্ধধর্মের প্রসারে নানাভাবে সহায়তা করেন। অনেক চীনাভিক্ষু তাঁর নিকট সর্বাস্তিবাদের অভিধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি ঐ সম্প্রদায়ের সূত্রপিটকের অন্তর্গত মধ্যমাগম ও সংযুক্তাগম নামক দুইখানি বিরাট গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাছাড়া তাঁর অনূদিত কয়েক খানি অভিধর্মগ্রন্থও পাওয়া যায়।

বিমলাক্ষ ছিলেন কাশ্মীরের আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি অতি অল্প বয়সেই দেশত্যাগ করেন বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করবার জন্য। তিনি প্রথমে মধ্য এশিয়ার কুচীরাজ্যের একটি প্রধান বৌদ্ধবিহারে আশ্রয় নেন। কুচীরাজ্যে অনেকদিন ধরেই বৌদ্ধধর্মের প্রচলন ছিল এবং খৃস্টীয় চতুর্থ শতকের দিকে কুচীর রাজধানী হয়ে উঠেছিল মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ-সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। কুচীতে তাঁর বহু ছাত্র জুটেছিল, মধ্য এশিয়ার নানা স্থান হতে বৌদ্ধভিক্ষুরা তাঁর নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে এসেছিলেন। কুচায় তাঁর আর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কুমারজীব। কুমারজীবের পিতা ছিলেন একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণপণ্ডিত নাম কুমারায়ণ আর তাঁর মাতা জীবা ছিলেন কুচীরাজ্যের রাজদুহিতা। কুমারজীব বাল্যকালেই তাঁর মায়ের সঙ্গে কাশ্মীরেই বিমলাক্ষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। কুমারজীবও এই সময়ে মধ্য এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

বিমলাক্ষ ও কুমারজীব কুচীতে শাস্ত্রালোচনায় আনন্দে দিন অতিবাহিত করছিলেন। নানা দেশের বৌদ্ধভিক্ষুরা এসেছিল তাঁদের নিকট শাস্ত্রালোচনার জন্য। এই সময়ে (৩৮৩ খৃস্টাব্দে) চীনা সৈন্যেরা কুচীরাজ্য আক্রমণ করল। কুচীরাজ্যের রাজধানী হল তাদের হাতে ভূমিসাৎ।

চীনাদের হাতে অনেকে বন্দী হল। কুমারজীবও বন্দীহিসাবে চীনদেশে যেতে বাধ্য হলেন। পরে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন ও যথেষ্ট সম্মানও লাভ করেছিলেন। সম্রাটের আদেশে তিনি সমস্ত চীনা-বৌদ্ধ জগতে গুরু বলে স্বীকৃত হন।

কুমারজীব যখন চীনদেশের রাজধানীতে অধ্যাপনা ও অনুবাদকার্যে রত, তখন বিমলাক্ষ কুচী ত্যাগ করে মধ্য এশিয়ার অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কার্যে লেগেছেন। ৪১৩ খৃস্টাব্দে কুমারজীবের মৃত্যুর পর তাঁর চীনদেশে ডাক পড়ল। তাঁর পক্ষেই কুমারজীবের কয়েকখানি অসমাপ্ত অনুবাদ শেষ করা সম্ভব ছিল। তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং চীন-দেশে উপনীত হয়ে কুমারজীবের আরব্ধ সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের বিনয়পিটকের অনুবাদ শেষ করলেন।

খৃস্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমভাগে আর একজন খ্যাতনামা ভারতীয় পণ্ডিত ছিলেন বুদ্ধভদ্র। বুদ্ধভদ্র জন্মগ্রহণ করেন কপিলবস্তু নগরে এবং শাক্যবংশে। অল্পবয়সে তাঁর পিতামাতার মৃত্যু হয়। তিনি পালিত হন মাতামহ কুবলয়ের আশ্রয়ে। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবার পর তিনি নানা স্থানে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করে অবশেষে কাশ্মীরে উপনীত হন। কাশ্মীরে তখনকার শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ-পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রে গভীরভাবে প্রবেশ করবার সুযোগ লাভ করেন। কাশ্মীর থেকেই তিনি বিদেশ যাত্রা করেন। এই সময়ে চীনদেশ হতে চে-ইয়েন নামক একজন বৌদ্ধ-পণ্ডিত কাশ্মীরে আসেন সংস্কৃতভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য। তাঁরই অনুরোধে বুদ্ধভদ্র চীনযাত্রা করেন এবং অনুমান ৪১৬ খৃস্টাব্দের দিকে চীনদেশে উপনীত হন। তিনি চীনদেশের দক্ষিণাংশে নানা স্থানে অধ্যাপনা করেন ও চীনা বৌদ্ধপণ্ডিতদের সংস্কৃতভাষা শিক্ষা দেন। এই সময়ে চীনদেশের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠান ছিল লু-শান। হুই-ইউয়ান

নামক একজন খ্যাতনামা বৌদ্ধভিক্ষু এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। হুই-ইউয়ান এক নূতন মতবাদের সৃষ্টি করেন এবং এই কাজে তিনি উৎসাহ ও পরামর্শ পেয়েছিলেন বুদ্ধভদ্রের নিকট হতে।

এই সময় ফা-হিয়েন ভারতবর্ষ থেকে নানা পুঁথিপত্র নিয়ে দক্ষিণ চীনে উপনীত হন। এই সব পুঁথিপত্র অনুবাদে শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করেন বুদ্ধভদ্র। তিনি মোট পনেরোখানি গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করেন। এইসব গ্রন্থের মধ্যে প্রধান হচ্ছে 'অবতংসক সূত্র'। এই সূত্র মহাযান বৌদ্ধধর্মের একখানি বিরাট গ্রন্থ। নেপালে বৌদ্ধদের মধ্যে এই গ্রন্থ গণ্ডব্যূহ নামে পরিচিত। বুদ্ধভদ্র ছিলেন ধ্যানপন্থী। তিনি ধ্যান বা যোগশাস্ত্রের নানা বৌদ্ধগ্রন্থও চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। ৪২৯ খৃস্টাব্দে চীনদেশেই বুদ্ধভদ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাঁর ষাট বৎসরের উপর বয়স হয়েছিল।

বুদ্ধভদ্র যখন নানকিং অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রসারকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তখন উত্তর-চীনে বুদ্ধযশস্ নামক আর একজন কাশ্মীরী বৌদ্ধপণ্ডিত কুমারজীবের অসমাপ্ত কার্য সম্পন্ন করায় ব্যস্ত ছিলেন। কুমারজীবের আমন্ত্রণেই তিনি চীনদেশে আসেন। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও ছিল।

বুদ্ধযশস্ অল্পবয়সেই দেশত্যাগ করে মধ্য এশিয়ার কাশগর রাজ্যে উপনীত হন। ভারতবর্ষে, এদেশ সে যুগে শৈলদেশ নামে পরিচিত ছিল। শৈলদেশের অধিবাসীরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। রাজারাও ছিলেন বৌদ্ধ ও রাজধানীতে ছিল অসংখ্য বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠান। শৈলদেশের রাজা বুদ্ধযশসের পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে স্থান দিলেন রাজধানীর প্রধান বৌদ্ধায়তনে। বুদ্ধযশস্ রাজগুরুর পদে উন্নীত হলেন। কাশ্মীরে থাকতেই কুমারজীবের সঙ্গে বুদ্ধযশসের পরিচয় হয়েছিল। সেইজন্য কুচীরাজ্যে যাবার জন্য বুদ্ধযশস্ বিশেষ উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। এই

সময়েই চীনারা কুচী আক্রমণ করে। বুদ্ধযশসের পরামর্শে শৈলরাজ সসৈন্যে কুচীরাজের সহায়তা করবার জন্য রওনা হন কিন্তু কুচী পর্যন্ত পৌছবার পূর্বেই কুচীর রাজধানীর পতন হয়।

চীনদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করবার পরেই কুমারজীব বুদ্ধযশস্‌কে চীনে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ৪০৮ খৃস্টাব্দের দিকে বুদ্ধযশস্ চীনে কুমারজীবের নিকট উপস্থিত হন। কুমারজীবের অনুরোধে তিনি নানা বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ করেন— সর্বাস্তিবাদের সূত্রপিটকের 'দীর্ঘাগম' এবং ধর্মগুপ্ত সম্প্রদায়ের 'বিনয়পিটক' হচ্ছে এই সব অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে প্রধান। ৪১৩ খৃস্টাব্দে কুমারজীবের মৃত্যুর পরও বুদ্ধযশস্ কিছুকাল অধ্যাপনা ও অনুবাদের কাজ চালিয়েছিলেন। তাঁর কোন্ সময় মৃত্যু হয় সে সম্বন্ধে কোন সঠিক খবর পাওয়া যায় না।

এই যুগে কাশ্মীরের পুণ্যত্রাত নামক আর একজন পণ্ডিতও তাঁর শিষ্য ধর্মযশস্‌কে চীনদেশে যান। পুণ্যত্রাত খুব সম্ভব কুমারজীবের সঙ্গেই চীনে যান এবং নানা গ্রন্থ অনুবাদে তাঁকে সহায়তা করেন। তিনি নিজেও কনেকখানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাঁর শিষ্য ধর্মযশস্ খৃস্টীয় পঞ্চমশতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চীনদেশে ছিলেন ও নানাগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

খৃস্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে যে সব ভারতীয় পণ্ডিত চীনে যান, তাঁদের মধ্যে কাশ্মীরের গুণবর্মণের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গুণবর্মণ ছিলেন কাশ্মীরের এক রাজকুমার। তাঁর পিতা সংঘানন্দ কূট চক্রীদের চক্রান্তে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। বনে জঙ্গলে গুণবর্মণ তাঁর পিতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হন ও ধর্মশিক্ষালাভ করেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর মন্ত্রীপরিষদ্ একবাক্যে গুণবর্মণকে রাজপদে অভিষিক্ত করবার জন্য আহ্বান করলেন। গুণবর্মণ তখন ধর্মজীবনে এতদূর আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, রাজসিংহাসন আর তাঁকে

প্রলুব্ধ করতে পারল না। তিনি ভিক্ষুর বেশে দেশ ত্যাগ করলেন, বিদেশে বুদ্ধের বাণী প্রচার করবার জন্য।

গুণবর্মণ প্রথম সিংহলে গিয়ে উপনীত হলেন। সিংহল ছিল তখন বৌদ্ধ শাস্ত্রালোচনার একটি বড় কেন্দ্র। সিংহলে কিছুকাল অতিবাহিত করবার পর তিনি যবদ্বীপে যান। যবদ্বীপ তখন ছিল ভারতবর্ষের একটি বর্দ্ধিষ্ণু উপনিবেশ। যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম তখনও প্রচারিত হয় নি। গুণবর্মণের প্রভাবে যবদ্বীপের রাজারা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেন। যবদ্বীপে সেকালে বাণিজ্যব্যপদেশে বহু চীনা আসত। তারাই গুণবর্মণের খ্যাতি ও পাণ্ডিত্যের সংবাদ স্বদেশে বহন করে নিয়ে যায়। চীনদেশ হতে অনুরোধ এল গুণবর্মণকে চীনে পাঠাবার জন্য। গুণবর্মণ ৪২৪ খৃস্টাব্দে চীনদেশে উপনীত হলেন। চীনদেশের দক্ষিণাংশে নানাস্থানে ধর্মের বাণী প্রচার করবার পর তিনি রাজধানী নানকিঙে উপনীত হলেন ৪৩১ খৃস্টাব্দে। তিনি সম্রাটের আদেশে নানকিঙে জেতবন নামক বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করলেন ও জেতবন বিহার তাঁর অধ্যাপনার গুণে একটি শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। বহু চীনাভিক্ষু তাঁর নিকট শাস্ত্রালোচনা করতে আসত। তিনি নানকিঙে মাত্র এক বৎসর জীবিত ছিলেন— ৪৩১ খৃস্টাব্দেই তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু চীনদেশে তিনি যে ক-বৎসর ছিলেন তার মধ্যে বহুগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এ সব অনুবাদ চীনা-ত্রিপিটকে সযত্নে সংরক্ষিত হয়েছে।

গুপ্তযুগের এইসব খ্যাতনামা পণ্ডিতদের চেষ্টাতেই ভারত ও চীনদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক বহু শতাব্দী ধরে অক্ষুণ্ণ ছিল। ফলে ভারতীয় সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি চীনদেশের সভ্যতার উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার প্রমাণ এখনো নানাভাবে পাওয়া যায়।

গুপ্তোত্তর যুগে চীনদেশে ভারতীয় পণ্ডিত

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে চীনের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র আরও বেশী দৃঢ় হয়ে উঠলো। ফা-হিয়েন্ প্রমুখ চীনাভিক্ষুদের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে চীনা বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা ভারত সম্বন্ধে নানা খবর পেলেন এবং সে দেশে যাওয়া এবং সেখানে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করা যে অসম্ভব ব্যাপার নয় তাও বুঝতে পারলেন। চীনাভিক্ষুদের সংস্পর্শে এসে ভারতের নানা বৌদ্ধ-বিহারের পণ্ডিতেরা চীনদেশের নানা সংবাদ পেলেন এবং চীনদেশের পণ্ডিতদের বৌদ্ধশাস্ত্রে যে অধিকার আছে তাও বুঝতে পারলেন। কাশ্মীরের বৌদ্ধ-পণ্ডিতগণ মধ্য এশিয়া ও চীনদেশে গিয়ে যে ধর্ম ও শাস্ত্র প্রচারে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সে সংবাদও ভারতীয় বৌদ্ধ সমাজে অবিদিত ছিল না।

সেই কারণে খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম হতে ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে বৌদ্ধপণ্ডিতগণ চীনে যেতে আরম্ভ করেন। উজ্জয়িনীর পরমার্থ ও উপশূন্য ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে চীনদেশে যান। উপশূন্য অল্পদিনই চীনদেশে ছিলেন—এবং মাত্র ৬ খানি গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু পরমার্থের অবদান অনেক বেশী। পরমার্থের আর এক নাম গুণরত্ন। তিনি উজ্জয়িনীতে নানা শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে মগধে যান। খুব সম্ভব পাটলীপুত্র নগরে অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্য। এই সময়ে মগধের রাজার নিকট চীনসম্রাটের এক অনুরোধ আসে কোন খ্যাতনামা বৌদ্ধ-পণ্ডিতকে চীনদেশে পাঠাবার জন্য। পরমার্থের নাম তখন বৌদ্ধ-পণ্ডিত সমাজে সুবিদিত। রাজার অনুরোধে তিনি সমুদ্রপথে চীনদেশে রওনা হলেন এবং ৫৪৬ খৃস্টাব্দে দক্ষিণ-চীনে উপস্থিত হলেন। চীনসম্রাটের অনুরোধে তিনি ৫৪৮ খৃস্টাব্দে নানকিঙে যান এবং সেখানে অধ্যাপনা ও বৌদ্ধশাস্ত্রের চীনা অনুবাদের কার্যে ৫৫৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপৃত

থাকেন। ৫৬৯ খৃস্টাব্দে চীনদেশেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরমার্থ অন্যূন ৭০ খানি সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। এ সব গ্রন্থের মধ্যে বৌদ্ধদর্শনের গ্রন্থই বেশী—'মহাযান-সম্পরিগ্রহশাস্ত্র', 'মধ্যান্তবিভাগ-শাস্ত্র' 'বিজ্ঞানমাত্রতা সিদ্ধি' প্রভৃতি যোগাচার-বিজ্ঞানবাদের দার্শনিক গ্রন্থ, তর্কশাস্ত্র, অভিধর্ম এবং সাংখ্যকারিকা। সাংখ্যকারিকা বৌদ্ধশাস্ত্রের অন্তর্গত না হলেও বৌদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থে এর অনেক উল্লেখ আছে এবং বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা এ গ্রন্থের মূল অধ্যয়ন করতেন। অনূদিত গ্রন্থগুলির বিষয়-বস্তু থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় দর্শনশাস্ত্রে পরমার্থের বিশেষ অধিকার ছিল। চীনদেশে যোগাচার দর্শনের প্রচলনে তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলি যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

এই যুগে অন্যান্য যে সব ভারতীয় ভিক্ষু চীনদেশে যান তন্মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হচ্ছেন—বারাণসীর গৌতম প্রজ্ঞারুচি (৫১৬-৫৪৩), উড্ডিয়ানের বিমোক্ষসেন (৫৪১), পুরুষপুরের জিনগুপ্ত (৫৫৭-৬০৫) এবং লাটদেশের ধর্মগুপ্ত (৫৯০-৬১৯)। গৌতম প্রজ্ঞারুচি স্থলপথে চীনদেশে যান এবং প্রায় ২০ খানি গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। বিমোক্ষসেন উড্ডিয়ান (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সুবাস্তু প্রদেশে) জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে তাঁর পূর্বপুরুষগণ শাক্যবংশীয় এবং কপিলবস্তু হতে এসে উড্ডিয়ানে বসবাস করেন। তিনি চীনদেশে মাত্র এক বৎসর ছিলেন—এবং একখানি মাত্র গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। ঐ সময়ের মধ্যে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করেন। জিনগুপ্ত ৫৫৭ খৃস্টাব্দে চীনদেশে পৌছন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর গুরু এবং আচার্য—জ্ঞানভদ্র ও জিনযশস্। চীনসম্রাটের আদেশে রাজধানীতে তাঁদের জন্য নূতন সংঘারাম নির্মিত হল। সেখানে তাঁরা চীনাভিক্ষুদের বৌদ্ধশাস্ত্রে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। নানা বৌদ্ধগ্রন্থের চীনাভাষায় অনুবাদও করলেন। ৫৭২ খৃস্টাব্দে চীনদেশে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হল। তখন

জিনগুপ্ত শিষ্যদের নিয়ে মধ্য এশিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। ৫৮১ খৃস্টাব্দে চীনদেশে নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হল এবং দেশে শান্তি স্থাপিত হল। সম্রাটের আদেশে জিনগুপ্ত ৫৮৫ খৃস্টাব্দে আবার চীনদেশে ফিরলেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করলেন। তাঁর সহায়তায় বহু গ্রন্থ চীনাভাষায় অনূদিত হল। ৬০০ খৃস্টাব্দে জিনগুপ্তের চীনদেশেই মৃত্যু হয়।

জিনগুপ্তের চীনদেশে অবস্থান কালেই আর একজন বৌদ্ধ-পণ্ডিত চীনদেশের রাজধানীতে উপস্থিত হন। তাঁর নাম ধর্মগুপ্ত। লাটদেশে তাঁর জন্ম। তিনি ৫৯০ খৃস্টাব্দে চীনদেশে পৌছন। ৬১৯ খৃস্টাব্দে চীনদেশেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল তিনি চীনদেশের নানা স্থানে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকল্পে অধ্যাপনা করেন এবং বহু শাস্ত্রগ্রন্থের চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

খৃস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে চীনদেশে থাং বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই পরাক্রান্ত রাজবংশ প্রায় দশম শতক পর্যন্ত নির্বিবাদে রাজত্ব করেন এবং চীনদেশে দীর্ঘকালস্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয়। এই যুগেই সাহিত্য, ধর্ম, শিল্পকলা প্রভৃতিতে চীনারা চরম উন্নতি লাভ করে। বৌদ্ধধর্মেরও এই যুগে বহুল প্রসার হয় এবং ভারত ও চীনদেশের মধ্যে সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয়। বহু ভারতীয় পণ্ডিত এই সময়ে চীনদেশে যান। তাঁদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করে অমর হয়ে রয়েছেন। থাং যুগের প্রথমেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক চীনদেশে যান। তাঁর নাম প্রভাকরমিত্র। প্রভাকর নালন্দায় মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। বিদেশে বুদ্ধের বাণী প্রচার করবার জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে এবং তিনি দশজন শিষ্য সঙ্গে নিয়ে বিদেশ যাত্রা করেন। তিনি মধ্য এশিয়ার পথ অনুসরণ করে তুরুষ্ক বা তুর্কীদের দেশে উপস্থিত হন। মধ্য এশিয়ার

অধিকাংশই তখন তাদের অধীন। তুরুষ্কদের অধিনায়ক খান্ খানান্ তাঁকে অভ্যর্থনা করেন এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ দেখান। প্রভাকরমিত্রই সর্বপ্রথম তুর্কীদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। চীন-সম্রাটের অনুরোধে খান্ খানান্ ৬২৭ খৃস্টাব্দে প্রভাকরকে চীনদেশে প্রেরণ করেন। ৬২৭ খৃস্টাব্দে প্রভাকর চীনের রাজধানী চাং-আন্ শহরে উপস্থিত হন এবং এক বৌদ্ধবিহারে আশ্রয় নেন। সম্রাটের আদেশে তিনি কয়েক-খানি গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন—তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে অসঙ্গের মহাযানসূত্রালঙ্কার। ৬৩৩ খৃস্টাব্দে চীনদেশেই প্রভাকরের মৃত্যু হয়।

সপ্তম শতকের মধ্যভাগে নানা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য মধ্য এশিয়ার পথ বিপদসঙ্কুল হয়ে ওঠে। সেই কারণে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা সমুদ্রপথে চীনদেশে যেতে আরম্ভ করেন। সপ্তম শতকের শেষভাগে বোধিরুচি ছিলেন দক্ষিণদেশে একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। ৬৯২ খৃস্টাব্দে চীন থেকে চালুক্য রাজাদের নিকট এক রাজদূত আসেন এবং তাঁর বিশেষ অনুরোধে বোধিরুচি চীনদেশে যেতে সম্মত হন। তিনি সমুদ্রপথে রওনা হয়ে ৬৯৩ খৃস্টাব্দে চীনদেশের রাজধানীতে উপস্থিত হন। সম্রাটের অনুরোধে বোধিরুচি বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদ আরম্ভ করেন। চীনদেশে তখন আরো অনেক বৌদ্ধ-পণ্ডিত ও ভারতীয় দোভাষী ছিলেন। তাঁরা বোধিরুচিকে সাহায্য করবার জন্য নিযুক্ত হলেন। ভারতবর্ষের মধ্য-প্রদেশের রাজদূত ব্রহ্ম, ভারতীয় ভিক্ষু চন্দ এবং আরো অনেকে বোধিরুচিকে সাহায্য করেন। সংস্কৃতজ্ঞ চীনাভিক্ষুরাও তাঁকে সাহায্য করেন। তিনি ৭০৬ খৃস্টাব্দে সম্রাটের সঙ্গে উত্তর-প্রদেশে চাং-আন শহরে যান এবং সেখানেও নানা গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এখানেও যে সব ভারতীয় দোভাষীরা তাঁকে সাহায্য করেন তাঁদের মধ্যে পূর্ব-ভারতের একজন রাজপুত্র ঈশ্বর, এবং বৌদ্ধভিক্ষু ধর্ম ও প্রজ্ঞাগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। ৭২৭ খৃস্টাব্দে বোধিরুচির মৃত্যু

হয়। তিনি ৫৬ খানি বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদ করেন—তন্মধ্যে রত্নকূট নামক মহাযানসূত্র গ্রন্থ বিরাট।

খৃস্টীয় অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত চীনদেশে যান। তাঁর নাম শুভাকর সিংহ। কপিলবস্তুর শাক্যবংশে তাঁর জন্ম এবং নালন্দায় তাঁর শিক্ষা। মধ্য এশিয়ার পথে নানা বিপদ সত্ত্বেও তিনি সেই পথেই চীন যাত্রা করেন এবং ৭১৬ খৃস্টাব্দে উত্তর-চীনে লো-ইয়াং শহরে উপস্থিত হন। সেইখানে বোধিরুচির সহিত তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ৭৩৫ খৃস্টাব্দে চীনদেশেই শুভাকর সিংহের মৃত্যু হয়। তিনি চীনদেশে তান্ত্রিকমতের বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেন এবং নানা বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করেন।

তান্ত্রিক বৌদ্ধমত চীনদেশে আরো প্রবলভাবে প্রচারিত হয় বজ্রবোধি ও তাঁর শিষ্য অমোঘবজ্রের চেষ্টায়। বজ্রবোধি ছিলেন মধ্য-ভারতের রাজা ঈশানবর্মার পুত্র। তিনি অল্পবয়সেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং নালন্দায় শিক্ষালাভ করেন। নালন্দায় শিক্ষা শেষ করে তিনি পশ্চিম-ভারতে বলভীনগরে যান। বলভীও ঐ যুগে শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। পরে তিনি দক্ষিণে কাঞ্চীনগরে যান, পল্লব-রাজ নরসিংহ পোতবর্মনের পুত্রের শিক্ষক হয়ে। কিছুকাল পরে তিনি সিংহলে উপস্থিত হন। সিংহলরাজ তাঁকে চীনদেশে প্রেরণ করেন চীনসম্রাটকে বৌদ্ধশাস্ত্র উপহার দেবার জন্য। ৭২০ খৃস্টাব্দে বজ্রবোধি ক্যাণ্টন শহরে উপনীত হন। চীনদেশে নানা পণ্ডিত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ৭৩০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের নানা গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই নূতন ধর্মমত চীনা-বৌদ্ধসমাজকে আকৃষ্ট করে এবং বজ্রবোধির নাম নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ৭৩২ খৃস্টাব্দে লো-ইয়াং শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

বজ্রবোধির প্রধান শিষ্য অমোঘবজ্রও চীনদেশে এই নূতন ধর্মপ্রচারে

জীবনপাত করেন। ৭১৯ খৃস্টাব্দ থেকে ৭৩২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তাঁর গুরু বজ্রবোধির সঙ্গে ছিলেন। গুরুর মৃত্যুর পর তিনি ভারতবর্ষে ফিরে যান বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবং প্রায় ৫০০ বৌদ্ধ-পুঁথি নিয়ে ৭৪৬ খৃস্টাব্দে চীনদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সমস্ত গ্রন্থের অনুবাদে ও নূতন ধর্মমতের প্রচারেই তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ৭৭৪ খৃস্টাব্দে চীনদেশেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর অনূদিত ৭৭ খানি গ্রন্থ এখনো পাওয়া যায়।

অমোঘবজ্রের মৃত্যুর পর থেকে ভারতের সঙ্গে চীনদেশের যোগসূত্র শিথিল হয়ে আসে। তার প্রধান কারণ চীনদেশের রাজনৈতিক অবস্থার অনিশ্চয়তা, ভারতেও ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ ও বৌদ্ধধর্মের অবনতি। খৃস্টীয় দশম ও একাদশ শতকেও ভারতবর্ষ থেকে কয়েকজন বৌদ্ধভিক্ষু চীনদেশে যান: নালন্দার ধর্মদেব (৯৭৩-১০০১), পশ্চিম-ভারতের মঞ্জুশ্রী (৯৭১), বুদ্ধকীর্তি (৯৮৯), শান্তিকর (৯৯৫), বুদ্ধরক্ষ (৯৯৯), ধর্মরক্ষ (১০০৪) ইত্যাদি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নানা বৌদ্ধগ্রন্থের চীনা-অনুবাদ প্রকাশ করেন কিন্তু সে সব গ্রন্থের মধ্যে বেশীর ভাগই অর্বাচীন ও অপ্রয়োজনীয়। তাঁদের অনুবাদও নির্ভরযোগ্য নয়। এ যুগে পূর্বগামী চীনযাত্রী ভারতীয় পণ্ডিতদের ন্যায় আর কোনো শক্তিশালী পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্মের অবনতির সঙ্গেই ভারত ও চীনের মধ্যে যোগ ছিন্ন হয়ে যায়।

ভারতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক

চীন ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের কাজে চীনদেশের পরিব্রাজক ভিক্ষুদের অবদানও কম নয়। ইতিপূর্বে আমরা ফা-হিয়েন প্রমুখ দু একজন পরিব্রাজকের নাম উল্লেখ করেছি মাত্র। কিন্তু প্রাচীনকালে চীনদেশ থেকে বহু ভিক্ষু ভারতে এসেছিলেন। চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হবার পরেই সে দেশের বৌদ্ধ-পণ্ডিতদের মনে ভারতবর্ষে আসবার বাসনা প্রবল হতে থাকে। ভারত বুদ্ধের জন্মস্থান, সেইজন্য সে দেশকে তাঁরা মনে করতেন স্বর্গবিশেষ। ভারতের নূতন নামকরণ হয় "পশ্চিমের স্বর্গ"। সে দেশে তীর্থযাত্রা করে পুণ্য লাভের জন্য অনেকে ব্যগ্র হন। আবার কোনো কোনো ভিক্ষু বৌদ্ধশাস্ত্রে গভীরতর জ্ঞানলাভের জন্যও ভারতবর্ষে যাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

খৃস্টীয় তৃতীয় শতক থেকেই চীনাভিক্ষুরা ভারতবর্ষে যাবার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠেন। ২৬০ খৃস্টাব্দে চু শে-হিং নামক একজন ভিক্ষু ভারতে যাবার জন্য রওনা হন। তিনি অল্পবয়সেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং লো-য়াং শহরে পো-মা-সু মন্দিরে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি মধ্য এশিয়ার পথ অতিক্রম করে খোটানে উপস্থিত হন। খোটানের সঙ্গে তখন কাশ্মীরের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল বলে অনেক ভারতীয় পণ্ডিত খোটানে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন। চু শে-হিং তাঁদের সংস্পর্শে আসেন এবং খোটানেই জীবনের শেষভাগ অধ্যয়নে অতিবাহিত করেন। তিনি স্বদেশে ফিরে যান নি কিন্তু নিজের শিষ্যদের হাতে অনেক পুঁথিপত্র দেশে পাঠিয়েছিলেন।

চীনা-বৌদ্ধসাহিত্যের এক কিম্বদন্তী হতে জানা যায় যে তৃতীয় শতকে ২০ জন বৌদ্ধভিক্ষু ইউ-নান্ ও ব্রহ্মদেশের পথে ভারতে আসেন।

মগধের রাজা শ্রীগুপ্ত তাঁদের জন্য বোধগয়ায় একটি বিহার স্থাপন করেন এবং তার ব্যয় নির্বাহের জন্ম ভূমিদান করেন। এই বিহারের নাম ছিল চীন-সংঘারাম। খৃস্টীয় সপ্তম শতকেও এই সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান ছিল।

খৃস্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগে তাও-আন্ নামক এক বৌদ্ধভিক্ষুর শিক্ষায় চীনাদের মনে ভারতে যাবার বাসনা বদ্ধমূল হয়। তিনি লো-ইয়াং শহরে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যাপনার একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বৌদ্ধশাস্ত্র গভীরভাবে আলোচনা করবার জন্য ছাত্রদের উৎসাহিত করেন এবং সেজন্য ভারতে যাবার প্রয়োজনের কথা বলেন। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ করে একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। ৩৮৫ খৃস্টাব্দে তাও-আনের মৃত্যু হয়। তাঁর প্রচেষ্টা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়। তাঁর মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই দলে দলে চীনা ভিক্ষুরা ভারতে যাবার জন্য প্রস্তুত হন।

৩৯৯ খৃস্টাব্দে ফা-হিয়েন চারজন সঙ্গীসহ ভারতের পথে রওনা হন। তাঁর সঙ্গীদের নাম—হুই-চিং, তাও-চিং, হুই-ইং, এবং হুই-ওয়েই। মধ্য এশিয়ার পথে রওনা হয়ে যখন তাঁরা চীনের প্রান্তভাগে উপস্থিত হলেন তখন ভারতগামী আর একদল চীনাভিক্ষুদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হল। এ দলেও পাঁচজন ভিক্ষু ছিলেন—চে-ইয়েন, হুই-চিয়েন্, সেং-শাও, পাও-ইউন্ এবং সেং-চিং। তখন দুইদল একসঙ্গে ভারত অভিমুখে রওনা হন। তুন-হোয়াং থেকে তাঁরা প্রথমে অগ্নিদেশে (কারাশর) যান। অগ্নিদেশ থেকে সোজা মরুভূমি অতিক্রম করে খোটানে উপস্থিত হন। এ পথ ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। সেই কারণে সাধারণত পর্যটকেরা এ পথে না গিয়ে মধ্য এশিয়ার উত্তরাংশে জনপদবহুল দেশের পথে যাতায়াত করতেন। কিন্তু ফা-হিয়েন ও তাঁর সঙ্গীরা পথের কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এই পথেই মরুভূমি অতিক্রম করেন—অল্পসময়ের মধ্যে ভারতে

পৌছবার জন্য। খোটানে কিছুকাল অতিবাহিত করবার পর ফা-হিয়েন ও তাঁর সঙ্গীরা পামীর প্রদেশ অতিক্রম করে গিলগিটের পথে কাশ্মীরে উপস্থিত হন। এই দুর্গম পথে তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে হুই-চিং অসুস্থ হন এবং পুরুষপুরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হুই-ইং, পাও-ইউন ও সেং-চিং পুরুষপুর থেকেই স্বদেশে ফিরে যান। গন্ধার পৌছবার পর তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে অনেকে ঐ প্রদেশেই অবস্থান করেন। কিন্তু তাতেও ফা-হিয়েন নিরুৎসাহ হন নি। তিনি একাই দীর্ঘকাল ধরে উত্তর-ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। তিনি যে সব স্থান দর্শন করেন সেগুলি তখন বৌদ্ধশাস্ত্র-চর্চার প্রধান কেন্দ্র—উড্ডিয়ান, সুবাস্তু, গন্ধার, তক্ষশীলা, নগরহার, মথুরা, কান্যকুব্জ, কোশল, শ্রাবস্তী, কপিলবস্তু ও মগধ। ফা-হিয়েন মগধের অন্তর্গত পাটলীপুত্র, রাজগৃহ, গয়া ও বারাণসীতে কিছুকাল অবস্থান করেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের নানা পুঁথি সংগ্রহ করেন। মগধ থেকে তিনি চম্পায় (বর্তমান ভাগলপুর অঞ্চল) এবং পরে বঙ্গদেশে তাম্রলিপ্তিতে উপস্থিত হন। তাম্রলিপ্তি তখন বৌদ্ধশাস্ত্রালোচনার একটি বড়ো কেন্দ্র ছিল। সংস্কৃতভাষা শিক্ষার এবং বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ফা-হিয়েন সেখানে দুইবৎসর অতিবাহিত করেন। পরে তাম্রলিপ্তি হতে সমুদ্রপথে তিনি সিংহলে যান। সিংহলে কিছুকাল অবস্থান করবার পর বিদেশী বণিকদের সঙ্গে সমুদ্রপথে নানা বিপদ অতিক্রম করে ৪১৪ খৃস্টাব্দে চীনদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ফা-হিয়েন শুধু তীর্থভ্রমণ করেই ক্ষান্ত হন নি। তাঁর আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃতভাষা শিক্ষা এবং বৌদ্ধপুঁথি সংগ্রহ। ভারতবর্ষের নানা বৌদ্ধবিহারে অবস্থান করবার সময় তিনি সংস্কৃতভাষা ভালো ভাবেই শিক্ষা করেন। সে যুগে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের পুঁথি দুষ্প্রাপ্য হলেও তিনি অনেকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করেন—তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মহাসাংঘিক বিনয়পিটক ও মহীশাসক বিনয়পিটক। চীনে ফিরে যাবার পর তিনি

এই সব গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। ভারতবর্ষে অবস্থানকালে তিনি নানা বৌদ্ধমন্দির থেকে বুদ্ধমূর্তির মাপ সংগ্রহ করেন এবং ছবিও এঁকে নিয়ে যান। এই সব উপাদান বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে চীনা-শিল্পীদের প্রয়োজনে লেগেছিল। ফা-হিয়েনের ভারতভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছিল। তিনি সে দেশকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জেনেছিলেন—ভারতীয় আচার্যদের নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং স্বদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধশাস্ত্রের জ্ঞানের প্রসারে বিদেশী ধর্মপ্রচারকদের চেয়ে বেশী সাহায্য করতে পেরেছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি একখানি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন—তাতে প্রধান প্রধান স্থানের পরিচয়, বৌদ্ধধর্মের তৎকালীন অবস্থা ও দেশের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ চীনাভিক্ষুদের ভারতবর্ষের দিকে আরো বেশী আকৃষ্ট করে। পাও-ইউন্‌ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবার পর ভারত সম্বন্ধে একখানি অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু সে গ্রন্থ অধুনা লুপ্ত।

ফা-হিয়েন যখন ভারতভ্রমণ করছিলেন তখন চীনের রাজধানী থেকে আর একজন বৌদ্ধভিক্ষু ভারতবর্ষের দিকে রওনা হন—তাঁর নাম চে-মং। তিনি ১৪ জন সঙ্গী নিয়ে ৪০৪ খৃস্টাব্দে মধ্য এশিয়ার পথে ভারত যাত্রা করেন। শেন্‌-শেন্‌ (ক্রোরৈণ), কুচী, খোটান প্রভৃতি দেশ পরিদর্শন করে পামীর অতিক্রম করে পরিশেষে কাশ্মীরে উপনীত হন। পথের কষ্টে তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে একজন মৃত্যুমুখে পতিত হন, দশ জন স্বদেশে ফিরে যান। তিনি মাত্র চারজন সঙ্গীসহ কাশ্মীরে উপস্থিত হন। কাশ্মীরে কিছুকাল অবস্থান করবার পর কপিলবস্তু, পাটলীপুত্র প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। তিনি নানা স্থানে বৌদ্ধশাস্ত্রের পুঁথি সংগ্রহ করে ৪২৪ খৃস্টাব্দে মধ্য এশিয়ার পথে স্বদেশে ফিরে যান।

৪২০ খৃস্টাব্দে ফা-ইয়ং নামক আর একজন ভিক্ষু ২৫ জন ভিক্ষু সঙ্গে নিয়ে তুর্ফান, কুচী, কাশগর প্রভৃতি দেশ হয়ে কাশ্মীরে আসেন। সংস্কৃত-

ভাষা শিক্ষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কাশ্মীরে কিছুদিন অবস্থান করবার পর উত্তর-ভারতে নানা তীর্থস্থান দর্শন করে সমুদ্রপথে স্বদেশে ফিরে যান। এই সময়ে আরো অনেক চীনাভিক্ষু ভারতে আসেন। তাঁদের নামও চীনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে—তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—তাও-পু, ফা-শেং, ফা-ওয়েই, তাও-ইও, ও তাও-থাই।

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে চীনদেশের সম্রাজ্ঞী সোং-ইউন্ নামক একজন দূতকে ভারতে প্রেরণ করেন। তাঁর সঙ্গে একজন বৌদ্ধ-ভিক্ষুকেও পাঠানো হয়, ভারতের নানা তীর্থস্থানে সম্রাজ্ঞীর পক্ষ থেকে পূজা দেবার জন্য। সোং-ইউন্ শেন্-শেন্ (ক্রোরৈণ), ছন্মদন, খোটান প্রভৃতি দেশ হয়ে গিলগিটের পথে ভারতে প্রবেশ করেন। তাঁর ভ্রমণ উত্তরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। উড্ডিয়ান ও গন্ধারদেশের নানা স্থান পরিদর্শন করে ৫২২ খৃস্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এর পর চীনদেশে রাজনৈতিক বিপ্লবের জন্য বহুদিন ধরে কোনো চীনাপরিব্রাজক আসেন নি।

ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে 'সুই' নামক এক নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হল এবং চীনদেশে আবার সুখ শান্তি ফিরে এল। ভারতের সঙ্গে চীনের যোগ সাময়িকভাবে ছিন্ন হয়েছিল। কিন্তু নূতন রাজবংশের চেষ্টায় সে যোগসূত্র আবার দৃঢ় হল। খৃস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমে সম্রাটের আদেশে ওয়ে-সিয়ে এবং তু হিং-মান্ মধ্য এশিয়ার পথে ভারতে রওনা হলেন। মধ্য এশিয়ার নানা স্থান পরিদর্শন করে তাঁরা কাশ্মীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করবার পর তাঁরা উত্তর-ভারতের নানা তীর্থস্থান দেখবার জন্য রওনা হন। রাজগৃহ, কপিলবস্তু, পাটলিপুত্র প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল কাটাবার পর তাঁরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

৬১৮ খৃস্টাব্দে চীন থাং রাজবংশের অধীনস্থ হয়। এই রাজবংশের রাজত্বকালে বহু চীনাভিক্ষু ও পণ্ডিত ভারতবর্ষে আসেন।

তাঁদের নাম চীনা বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে জানা যায়। তাঁদের মধ্যে অনেকে ভারতবর্ষেই শেষ জীবন যাপন করেন। এই সব চীনা পরিব্রাজকদের মধ্যে হিউয়ান্-সাং শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। হিউয়ান্-সাং স্বদেশেই সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রাচীন চীনা অনুবাদ পড়ে খুশী হতে না পেরে তিনি ভারতযাত্রা মনস্থ করেন—উদ্দেশ্য ছিল সে দেশের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের নিকট শিক্ষালাভ করা। এই যুগে চীনের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার তুর্কীদের বিবাদ চলছিল, সেই কারণে তিনি মধ্য এশিয়ার পথে বিদেশে যাবার জন্য সরকারী অনুমতি পেলেন না। কিন্তু তখন তাঁর ভারতে যাবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে—তিনি ৬২৯ খৃস্টাব্দে সরকারী অনুমতি না নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন। মধ্য এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের পথে কাও-ছাং (তুর্ফান). অগ্নিদেশ (কারাশর), কুচী ও ভরুক (ইয়াক্-আরিক) প্রভৃতি দেশ পরিদর্শন করে তিনি থিয়েন্-শান্ পর্বত অতিক্রম করলেন। তারপর তাস্কেন্দ, সমরকন্দ, ফারগানা, তোখারিস্তান প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়ে অবশেষে বাল্‌ক (বাহ্লীক) দেশে উপস্থিত হলেন। বাল্‌ক ছিল হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তরে বক্ষু বা আমুদরিয়া নদীর উপত্যকায় অবস্থিত এবং বৌদ্ধধর্মের একটি বিরাট কেন্দ্র। এখানে ভারতীয় বৌদ্ধ-পণ্ডিতদেরও আসা-যাওয়া ছিল। বাল্‌কে কিছুকাল অতিবাহিত করবার পর হিউয়ান্-সাং হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে বামিয়েনে আসেন। বামিয়েন থেকে তিনি কাবুল নদীর ধার বেয়ে—কপিশ (কাফিরিস্তান), লম্পাক (লামঘান্) নগর হার (জেলালাবাদ), গন্ধার (পেশোয়ার) প্রভৃতি দেশ হয়ে উত্তর-ভারতে পৌঁছলেন।

হিউয়ান-সাং ভারতবর্ষে প্রায় ১৪ বৎসর ছিলেন এবং ভারতের প্রতি প্রদেশেই গিয়েছিলেন। যে সমস্ত স্থান তিনি পরিদর্শন করেন তার নাম থেকেই এ কথা বোঝা যাবে :

উত্তর-ভারত—উদকখণ্ড, উড্ডিয়ান, তক্ষশীলা, সিংহপুর, কাশ্মীর, পর্ণোৎস, রাজপুর, টক্ক, চীনভুক্তি, জালন্ধর, কুলূত, পারিযাত্র, মথুরা স্থানেশ্বর, অযোধ্যা, শ্রুঘ্ন, মতিপুর, ব্রহ্মপুর, গোবিশন (?), অহিচ্ছত্র, সাংকাশ্য, কান্যকুব্জ, হয়মুখ, প্রয়াগ, কৌশাম্বী, বিশোক, শ্রাবস্তী, কপিলবস্তু, লুম্বিনী, রামগ্রাম, কুশীনগর, বারাণসী, বৈশালী, বৃজি, নেপাল।

পূর্বভারত—মগধ, পাটলীপুত্র, রাজগৃহ, গয়া, গৃধ্রকূট, নালন্দা, হিরণ্য-পর্বত (?), চম্পা, কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ, ওড্র, চরিত্রপুর, কোঙ্গোদ, কলিঙ্গ।

দক্ষিণ-ভারত—কোশল, অন্ধ্র, ধান্যকটক, চোল, দ্রাবিড়, মলকূট, কোঙ্কনপুর, মহারাষ্ট্র।

পশ্চিম-ভারত—ভৃগুকচ্ছ, মালব, খেড়, বলভী, আনন্দপুর, সুরাষ্ট্র গুর্জর, উর্জয়ন্ত, মহেশ্বরপুর, সিন্ধু, মুলস্থানপুর, (? মুলতান), পর্বত(?),···।

হিউয়ান-সাং মধ্য এশিয়ার পথে কাশগর, খোটান, নিয়া, সেন-সেন প্রভৃতি হয়ে ৬৪৫ খৃস্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। যদিও তিনি সম্রাটের অনুমতি না নিয়েই বিদেশ যাত্রা করেছিলেন, তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর সম্রাট তাঁকে নিজে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁর কার্যে নানা ভাবে সহায়তা করেন। হিউয়ান্-সাং ভারতবর্ষ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছিলেন। নানা স্থানে বৌদ্ধবিহারে দীর্ঘকাল বাস করে স্থানীয় পণ্ডিতদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। নালন্দা মহাবিহারে বিখ্যাত পণ্ডিত শীলভদ্রের নিকট বৌদ্ধদর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। সম্রাট হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল—এবং হর্ষবর্ধন তাঁর সম্মানার্থে নানা সভাসমিতি আহ্বান করেছিলেন এবং শাস্ত্রালোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। হর্ষবর্ধনের রাজধানীতেই কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে। স্বদেশে ফিরে তিনি নিজে ভারতীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেন এবং তাঁর অনুরোধে হর্ষবর্ধন ও চীনসম্রাটের মধ্যে দূত বিনিময় হয়।

চীনদেশে গভীরভাবে বৌদ্ধদর্শন ও সাহিত্য আলোচনার পথও ইউয়ান-সাং সুগম করে দেন। ভারত থেকে তিনি বৌদ্ধ-শাস্ত্রগ্রন্থের প্রায় ৭০০ পুঁথি স্বদেশে নিয়ে যান। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় সতের বৎসর দীর্ঘ পরিশ্রম করে তিনি ৭২খানি গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। এই সব গ্রন্থের অনেকগুলি বিরাটাকার। তাঁর অধ্যাপনার গুণে বহু ছাত্র তাঁর নিকট আসতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কৃতী ছাত্রেরাই তাঁর কাজ চালিয়ে যান। এই সব ছাত্রদের মধ্যে কুই-চির নাম অমর হয়ে রয়েছে। কুই-চি সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করেছিলেন এবং বৌদ্ধদর্শনও গভীরভাবে আলোচনা করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধদর্শনের যে সব টীকা রচনা করেন তার মৌলিকতা আজও স্বীকৃত হয়।

হিউয়ান-সাং দেশে ফিরবার অল্পকাল পরেই চীনসম্রাট লি ই-পিয়াও এবং ওয়াং হিউয়ান-সে নামক দুই ব্যক্তিকে দূত হিসাবে হর্ষবর্ধনের নিকট পাঠান। কান্যকুব্জে রাজকীয় কাজ শেষ করবার পর তাঁরা রাজগৃহ গৃধ্রকূট, বোধগয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করেন। মহাবোধি মন্দিরে সম্রাটের পক্ষ থেকে পূজা দেন এবং ৬৪৭ খৃস্টাব্দে স্বদেশে ফিরে যান। এর পর ওয়াং হিউয়ান-সে আরো তিনবার (৬৪৭, ৬৫৭ ৬৬৪ খৃস্টাব্দ) ভারতবর্ষে আসেন; প্রতিবারেই চীনসম্রাটের আদেশ বহন করে।

এই সময়ে তিব্বতের সঙ্গে ভারত ও চীনের যোগসূত্র স্থাপিত হয়, এবং চীন থেকে তিব্বতের পথে ভারতে আসা সম্ভব হয়। ওয়াং হিউয়ান-সে শেষবার এই পথেই ভারতে আসেন।

বিদেশযাত্রী চীনাভিক্ষুদের একখানি জীবনী আছে। তা থেকে জানা যায় যে খৃস্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অন্যূন ৬০ জন চীনাভিক্ষু ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জন ছিলেন কোরিয়াদেশের এবং মধ্য এশিয়ার কিন্তু শিক্ষালাভ করেন চীনদেশে। তাঁদের মধ্যে

অনেকেই ছিলেন তর্থযাত্রী—ভারতে নানা বৌদ্ধতীর্থ দর্শন করে পুণ্য লাভ করাই ছিল তাঁদের অভিপ্রায়। তাঁদের মধ্যে অনেকে ভারতেই শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে হিউয়ান-চাও-এর নাম স্মরণীয়। তিনি সম্ভবত হিউয়ান-সাং-এর শিষ্য ছিলেন। ৬৫০ খৃস্টাব্দের দিকে তিনি মধ্য এশিয়ার পথে ভারত যাত্রা করেন। মধ্য এশিয়ার নানা স্থান হয়ে তিব্বতের পথে জালন্ধরে উপস্থিত হন। জালন্ধরে কিছুকাল অবস্থান করবার পর তিনি উত্তর-ভারতের নানা স্থান দর্শন করেন ও পরিশেষে নালন্দায় আসেন। তিনি বৌদ্ধদর্শন অধ্যয়নের জন্য নালন্দায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন। ৬৬৪ খৃস্টাব্দে চীনসম্রাটের আদেশে ওয়াং হিউয়ান-সে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যান। অল্পদিন পরেই কাশ্মীরের একজন ব্রাহ্মণকে স্বদেশে পৌঁছে দেবার জন্য সম্রাট হিউয়ান-চাওকে পুনরায় ভারতে প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মণকে পৌঁছে দেবার পর হিউয়ান-চাও কপিশ বাহ্লীক, সিন্ধু, লাট ও পরে দাক্ষিণাত্যে যান। পরে নালন্দায় নিজের প্রাক্তন অধ্যাপক ও সহপাঠীদের সঙ্গে দেখা করে স্বদেশ যাত্রা করেন। ইউয়ান-চাও-এর এবার আর দেশে ফেরা হল না—মধ্য এশিয়া ইতিমধ্যে আরবদের হস্তগত হয়েছে। তিব্বত ও চীনের মধ্যেও যুদ্ধ বেধেছে। কোনো পথেই স্বদেশে ফেরা অসম্ভব দেখে তিনি শেষজীবন ভারতেই অতিবাহিত করেন।

খৃস্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগে আর একজন খ্যাতনামা চীনাভিক্ষু ভারতে আসেন। তাঁর নাম ই-চিং। তিনি ৬৭১ খৃস্টাব্দে সমুদ্রপথে ভারত যাত্রা করেন। পথে তিনি শ্রীবিজয়ে (সুমাত্রা) অবতরণ করেন এবং সংস্কৃতভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্রের উপযুক্ত শিক্ষক পেয়ে সেখানেই কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। শ্রীবিজয়ের বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ও আচার ব্যবহার দেখে তিনি খুশী হয়েছিলেন। শ্রীবিজয়ে কিছুকাল অধ্যয়নের পর তিনি ভারতে আসেন। তাম্রলিপ্তি, রাজগৃহ, কুশীনগর, বারাণসী

প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল কাটিয়ে তিনি নালন্দায় উপস্থিত হন। ই-চিং নালন্দায় প্রায় দশ বৎসর কাটান। এই সময়ে তিনি স্থানীয় অধ্যাপকদের নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং নানা পুঁথির প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন। ৭৯০ খৃস্টাব্দে তিনি বহু পুঁথিপত্র নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সংস্কৃতভাষায় তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তিনি অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

থাংযুগের ভারতযাত্রী শেষ বৌদ্ধভিক্ষু হচ্ছেন—উ-খোং। ৭৫১ খৃস্টাব্দে সম্রাটের আদেশে তিনি কপিশ দেশের রাজদূতকে পৌঁছে দেবার জন্য ভারত যাত্রা করেন। তিনি মধ্য এশিয়ার পথে কুচী, কাশগর, পামীরের অন্তঃপাতী বোক্কন প্রভৃতি দেশ হয়ে গিলগিটের পথে উড্ডিয়ানে উপস্থিত হন। উড্ডিয়ান থেকে গন্ধার এবং পরে কপিশে যান। উ-খোং পূর্বে গৃহী ছিলেন, কপিশে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষু হন। অতঃপর তিনি কাশ্মীরে যান। সেখানে দীর্ঘকাল বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের পর নানা তীর্থস্থান দর্শন করে ৭৯০ খৃস্টাব্দে স্বদেশে ফিরে যান।

পূর্বেই বলেছি যে নবম শতক থেকে চীন ও ভারতের মধ্যে যোগসূত্র শিথিল হয়ে পড়ে। দশম শতকের শেষভাগে 'সুং' নামক রাজবংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। 'সুং' যুগেও ভারতের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করবার চেষ্টা হয় এবং একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে সকল চীনাভিক্ষু ভারতে আসেন তাঁদের সংখ্যাও খুব অল্প নয়। ৯৬৪ খৃস্টাব্দে ৩০০ চীনাভিক্ষু ভারতে তীর্থযাত্রা করেন এবং বারো বৎসর পর স্বদেশে ফিরে যান। ৯৬৬ খৃস্টাব্দে সম্রাটের আদেশে ১৫৭ জন ভিক্ষু ভারতযাত্রা করেন—নানা তীর্থস্থানে সম্রাটের পক্ষ থেকে পূজা দেবার জন্য। ১০৩১ খৃস্টাব্দে হুয়েই-ওয়েন নামক একজন ভিক্ষু ভারত যাত্রা করেন এবং ১০৩৯ খৃস্টাব্দে দেশে ফিরে যান। হুয়েই-ওয়েনের পর আর কোনো ভিক্ষু

ভারতে আসেন নি। স্থংযুগের এই সব ভিক্ষুরা শুধু তীর্থদর্শনের জন্যই ভারতে এসেছিলেন। বৌদ্ধসাহিত্য, দর্শন ও শিল্পে তাঁদের কোনো অভিরুচি ছিল না। চীনদেশ হিউয়ান-সাং, ই-চিং প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতো তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতদের আর দেখা যায় নাই।

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম

ভারতীয় পণ্ডিতদের শিক্ষার গুণে এবং চীনা ভিক্ষুদের নিষ্ঠার প্রভাবে চীনদেশের জনসাধারণ অতি অল্পকালের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মকে নিজস্ব করে নিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের এই ব্যাপক প্রসারের আর একটি প্রধান কারণ ছিল যে চীনদেশে পূর্বে কোন ধর্ম ছিল না। কনফ্যুসিয়সের শিক্ষার মধ্যে ধর্মের এমন কোন বীজ ছিল না যা অঙ্কুরিত হয়ে জনসাধারণের উপযোগী একটি ধর্মমতে পরিণত হতে পারত। কনফ্যুসিয়স রাষ্ট্র ও সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্যই তাঁর সমস্ত জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। চীনদেশের অন্য মহাপুরুষ লাও-জু একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মত স্থাপন করেছিলেন। এই দার্শনিক মতে পরম সত্য উপলব্ধির জন্য সাধনার প্রয়োজন আছে, অপ্রাকৃত সংসারের বন্ধন ছিন্ন করবার কথা আছে, ধ্যান ধারণার কথাও আছে। কিন্তু তবুও লাও-জুর দার্শনিক মত ব্যক্তিগত সাধনার গণ্ডীর বাইরে পৌঁছয় নি, তা জনসাধারণের ধর্মপিপাসা মিটাতে পারে নি। চীনারা যখন বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পরিচিত হল তখন যে সে ধর্ম তাদের ধর্মপিপাসা মিটাতে পারবে তা তারা বুঝতে পারল।

খৃস্টীয় তৃতীয় শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম উত্তর-চীনেই নিবদ্ধ ছিল। রাজধানী চাং-আন্ শহরের শ্বেত-অশ্ববিহারই ছিল বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রধান কেন্দ্র। তৃতীয় শতকের প্রথমে হান্ বংশের পতনের পর অনেক বৌদ্ধভিক্ষু দক্ষিণে নান্‌কিঙে আশ্রয় নিলেন এবং তাঁদের চেষ্টায় ঐ অঞ্চলেও বৌদ্ধদের একটি বিরাট কেন্দ্র গড়ে উঠল। প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যেই নান্-কিঙে ১৮০টি বিহার স্থাপিত হয়।

চতুর্থ শতকের শেষভাগে ওয়েই নামক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ওয়েই বংশের রাজারা ছিলেন বিদেশী। চীনদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার পর

তাঁরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন ও সে ধর্মের প্রসারে সহায়তা করতে লাগলেন। ওয়েই বংশের রাজারা প্রায় দুশো বৎসর উত্তর-চীনে রাজত্ব করেছিলেন। চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এই দুশো বৎসর একটি স্মরণীয় যুগ। এই যুগে রাজাদের আদেশে চাং-আন্ এবং লো-ইয়াং নগরে ৪৭টি বিরাট আকারের সংঘারাম স্থাপিত হয়। উত্তর-চীনে শান্-শি প্রদেশের অন্তর্গত ইউন্-কাং এবং কান-স্থ প্রদেশে তুন-হোয়াং নামক স্থানে পাহাড় কেটে বহু গুহা-মন্দির নির্মিত হয়। তা ছাড়া রাজন্যবর্গের চেষ্টায় ৮৩৯ টি বৌদ্ধ-মন্দির এবং গৃহী-বৌদ্ধদের চেষ্টায় প্রায় ৩০ হাজার স্তূপ নির্মিত হয়। এই সময়ে চীনে বৌদ্ধভিক্ষু ও বৌদ্ধভিক্ষুণীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ লক্ষ। এ থেকেই বোঝা যাবে যে ওয়েই যুগে চীনে বৌদ্ধধর্ম কত দ্রুত প্রসারলাভ করেছিল।

পরবর্তী যুগে চীনদেশে নানা বৌদ্ধসম্প্রদায় স্থাপিত হয়েছিল। এই সব সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে চীনদেশের জনসাধারণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায় কি ভাবে বৌদ্ধধর্মকে নিজস্ব করে নিয়েছিল।

(১) লু-শান সম্প্রদায়—৩৮১ খৃস্টাব্দে হুই-ইউয়ান নামক এক জন বৌদ্ধভিক্ষু কিয়াংসি প্রদেশে লু-শান্ নামক এক পাহাড়ের উপর একটি ছোট আশ্রম স্থাপন করেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যে স্থানটি মনোরম—লোকালয় থেকে বহুদূরে এবং নির্জনে সাধনার উপযুক্ত স্থান। হুই-ইউয়ানের ১২৩ জন শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে ১৭ জন শিক্ষা দীক্ষায় ছিলেন শ্রেষ্ঠ। সেই ১৭ জনকে নিয়েই তিনি তাঁর নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করলেন। এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত নাম—'শ্বেত পদ্ম সম্প্রদায়'। বৌদ্ধসাহিত্যে একখানি মহাযান-গ্রন্থ আছে, তার নাম 'সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র'। এই 'ধর্ম পুণ্ডরীক'ই 'শ্বেত পদ্ম' এবং সেই গ্রন্থে বর্ণিত সাধনপন্থাই এই সম্প্রদায়ের কাছে প্রামাণ্য। এই সম্প্রদায় অমিতাভ বুদ্ধের পূজা করেন, অমিতাভ

বুদ্ধের স্বর্গ সুখাবতীই তাঁদের চরম কাম্য। হুই-ইউয়ান সংস্কৃতভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন। কুমারজীবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় নি—কিন্তু পত্রালাপ ছিল। ধর্মযশস্ ও বুদ্ধভদ্র উত্তর-চীনে তাঁদের কাজ শেষ করবার পর লু-শানে এসে হুই-ইউয়ানের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং সম্ভবত তাঁর নূতন ধর্মমত রচনায় সহায়তা করেছিলেন। হুই-ইউয়ান তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কয়েক জনকে সংস্কৃত-পুঁথির সন্ধানে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই হুই-ইউয়ানের নাম চীনদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর জীবদ্দশাতেই লু-শানের নীরব সাধনার স্থান জনমুখর হয়ে ওঠে। প্রতি বৎসর প্রায় তিন হাজার বৌদ্ধ সেখানে তীর্থযাত্রা করতে আসত। হুই-ইউয়ানের ধর্মমত আলোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি ভারতীয় বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অনুকরণে তাঁর সম্প্রদায় গড়ে তোলেন নি। বৌদ্ধশাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা করে তিনি এমন একটি ধর্মমত খুঁজে পেয়েছিলেন যা তাঁর দেশবাসীর মনে সাড়া দিতে পারত। সেখানেই ছিল তাঁর মতবাদের মৌলিকতা। লু-শান সম্প্রদায়ের প্রভাব বহুদিন অক্ষুণ্ণ ছিল।

(২) ধ্যান সম্প্রদায়—খৃস্টীয় পঞ্চম শতকে চীনদেশে আর এক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়—তার চীনা নাম 'ছান্' (জাপানী জেন্)। এ নাম সংস্কৃত 'ধ্যান' শব্দের প্রাকৃত রূপ 'ঝান' থেকে নেওয়া। চীনে ধ্যান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বোধিধর্ম নামক একজন ভারতীয় সাধক।

বোধিধর্ম ছিলেন দক্ষিণ-ভারতে সম্ভবত কাঞ্চীপুরের রাজার তৃতীয় পুত্র। তিনি অল্পবয়সেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। যোগমার্গের যে পথ তিনি অবলম্বন করেছিলেন তাকে ধ্যানমার্গ বলা হয়। এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে ধ্যানমার্গে শুধু চিত্তের একাগ্রতাই প্রয়োজন হয়, আসন মুদ্রা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক

যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। কথিত আছে যে বোধিধর্ম ভারতীয় বৌদ্ধসমাজে এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে বুদ্ধদেবের পরিত্যক্ত প্রাচীন চীবর ও ভিক্ষাপাত্র তাঁকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়।

পঞ্চম শতকের শেষভাগে বোধিধর্ম নানাদেশ পর্যটন করে দক্ষিণ-চীনে উপনীত হন। দক্ষিণ-চীনের সম্রাট তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং বৌদ্ধধর্ম আলোচনা করবার জন্য তাঁকে আহ্বান করেন। সম্রাট তাঁর সঙ্গে আলোচনায় খুশী হলেন না। বোধিধর্মের দার্শনিক মতবাদ ছিল নাগার্জুনের মাধ্যমিক-দর্শনের অনুরূপ। তিনি সংসার প্রপঞ্চময় মনে করতেন এবং তাঁর হিসাবে সাংসারিক পাপপুণ্য, ধর্মকর্ম প্রভৃতির কোন সত্যকার মূল্য ছিল না। তাই সম্রাট যখন জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি বৌদ্ধধর্ম পালন করে এবং বহু মন্দির বিহার প্রভৃতি নির্মাণ করে কতটা পুণ্য সঞ্চয় করেছেন তখন বোধিধর্ম উত্তর দিলেন যে কোন পুণ্যই সঞ্চিত হয় নি। বোধিধর্মের এই অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য দক্ষিণ-চীনে তাঁর কোন স্থান হল না। তিনি উত্তর-চীনে গিয়ে সোং-শান নামক স্থানে ধ্যান ধারণা করতে লাগলেন।

উত্তর-চীনে বোধিধর্মের অনেক শিষ্য জুটল। তাঁর প্রধান শিষ্য হুই-কোর প্রচেষ্টায় ধ্যানসম্প্রদায় প্রসারলাভ করল এবং কালক্রমে দক্ষিণ-চীনে ও উত্তর-চীনে এই সম্প্রদায়ের নানা শাখার উদ্ভব হল। চীন ও জাপানে এখনো ধ্যান সম্প্রদায়ের প্রচলন আছে এবং ঐ দুই দেশের বৌদ্ধদের চিন্তাধারা এখনো বহুল পরিমাণে ধ্যানের আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত।

(৩) থিয়েন-থাই সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের জাপানে প্রচলিত নাম তেন্দাই। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা চি-থাই প্রথমে বোধিধর্মের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে নূতন সম্প্রদায় স্থাপন করেন। চি-থাই ৫৩১ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন

এবং নান্‌-কিঙে শিক্ষালাভ করেন। নির্জনে ধ্যান ধারণা করবার জন্য তিনি দক্ষিণ-চীনে হাং-চৌ থেকে প্রায় ১৮০ মাইল দূরে থিয়েন-থাই নামক স্থানে যান এবং একটি মন্দির নির্মাণ করে সাধনায় রত হন। এই থেকেই থিয়েন-থাই সম্প্রদায়ের সূত্রপাত।

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যেই চীনা-বৌদ্ধসাহিত্য বিপুল আকার ধারণ করেছিল। নানা সম্প্রদায়ের মূল গ্রন্থ চীনাভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এই সাহিত্য আলোচনা করে চি-থাই বুঝতে পারলেন যে তার মধ্যে কোন সংহতি নাই, অসঙ্গতিও যথেষ্ট আছে, তা ছাড়া পরস্পর বিরোধী মতবাদেরও অভাব নাই। এই সব কারণেই চীনের বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে অনেক সময়ে বিভ্রান্ত হতে হত। চি-থাই নানা বৌদ্ধমতের সমন্বয় সাধনে আত্মনিয়োগ করলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই বিপুল শাস্ত্রগ্রন্থ-গুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করলেন।

চি-থাই বৌদ্ধশাস্ত্রকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করলেন। বুদ্ধের শিক্ষার ধারা অনুযায়ী এই বিভাগ করা হল। চি-থাই দেখলেন যে বুদ্ধের ধর্মজীবন পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা চলে। বোধিজ্ঞান লাভ করবার পর ২১ দিন তিনি বোধিবৃক্ষতলে অবস্থান করেছিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁর সাধনালব্ধ চরম সত্য উদ্ঘাটিত করেন। তাঁর শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায় ছিল দ্বাদশবর্ষব্যাপী। এই সময়ে তিনি জনসাধারণের মধ্যে তাঁর ধর্ম শিক্ষা দেন—সে ধর্ম তাদের বোধগম্য করবার জন্য তাঁকে অনেক লৌকিক ব্যবহার অনুকরণ করতে হয়। তৃতীয় পর্যায় ছিল আট বৎসর ব্যাপী। এই সময়ে তাঁর শিষ্যদের মনের সন্দেহ দূর করবার জন্য অনেক প্রতিদ্বন্দী ধর্মমত খণ্ডন করতে হয়েছিল। সেই জন্য ব্যবহারিক সত্য ছাড়া পারমার্থিক সত্যের অবতারণাও তাঁকে মাঝে মাঝে করতে হত। চতুর্থ পর্যায় ছিল ২২ বৎসর ব্যাপী। এই সময়ে বিরুদ্ধ দার্শনিক মত খণ্ডন করবার জন্য তাঁকে তাঁর শিক্ষার চরম সত্যের আলোচনাই করতে

হয়েছিল। পঞ্চম পর্যায়ে—অর্থাৎ জীবনের শেষ আট বৎসর তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে, যারা অগ্রগতিসম্পন্ন, যারা তাঁরই মত বোধিজ্ঞান লাভের অধিকারী, তাদের জন্যই শিক্ষা দিয়েছিলেন।

চি-খাইয়ের এই সমন্বয়ের ফলে বৌদ্ধশাস্ত্র ও ধর্মমতের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আনা সম্ভব হল ; নানা ধর্মমতের মধ্যে পরস্পর বিরোধীভাবও দূর করা সম্ভব হল। চীন ও জাপানের বৌদ্ধ সম্প্রদায় অদ্যাবধি চি-খাইয়ের প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করে আসছেন। চি-খাই নিজে ধ্যানমার্গের সাধক ছিলেন। কিন্তু তিনি বহিরঙ্গের সাধনা—অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠ পূজা প্রভৃতি বর্জন করেন নি। সাধনার ক্ষেত্রেও তিনি একটি সমন্বয় আনতে পেরেছিলেন।

সপ্তম শতকে হিউয়ান্-সাং ভারতবর্ষ থেকে নূতন পুঁথিপত্র ও শিক্ষার ধারা নিয়ে আসেন। তাঁর শিক্ষার প্রভাবে চীনদেশে নানা নূতন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

(৪) ধর্মলক্ষণ সম্প্রদায়—জাপানে এই সম্প্রদায় হোস্সো নামে অভিহিত। অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর যোগাচার মতের উপরই এ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত। হিউয়ান্-সাং নালন্দায় যোগাচার সম্প্রদায়ের শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। সে সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত তাঁর মনকে আকৃষ্ট করেছিল। সে দর্শনের নানা মৌলিকগ্রন্থ তিনি চীনাভাষায় অনুবাদ করেন, তা ছাড়া বিভিন্ন টীকা অবলম্বনে একখানি নূতন গ্রন্থও রচনা করেন। সেই সব গ্রন্থ অবলম্বন করে এই নূতন দার্শনিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। চীনাভাষায় এ সম্প্রদায়ের নাম দেওয়া হয় ফা-সিয়াং ; এ নাম সংস্কৃত 'ধর্মলক্ষণে'র অনুবাদ। এই দার্শনিক মতে ব্যবহারিক জগতের উপাদান গুলির ধর্ম আখ্যা দেওয়া হয়। এই ধর্মের প্রকৃত সত্তা মনোজগতে বা বিজ্ঞানে। সে সব ধর্মের সৃষ্টিও হচ্ছে এক মূল বিজ্ঞানপ্রবাহ হতে—তাকে বলা হয় আলয়-বিজ্ঞান। সুতরাং এই আলয়-বিজ্ঞানের প্রবাহেই

বস্তুজগতের সৃষ্টি। সেই সৃষ্টি বা বিজ্ঞানের প্রবাহকে রোধ করেই পরম সত্যে উপনীত হওয়া যায়। এই হচ্ছে ধর্মলক্ষণ সম্প্রদায়ের মূল কথা, যোগাচার মতে বৌদ্ধধর্মেরও মূল কথা। এই সম্প্রদায়ের মতবাদ চীন ও জাপানে অদ্যাবধি অনুসৃত হয়।

(৫) কোশ সম্প্রদায়—কোশ হচ্ছে বসুবন্ধুর 'অভিধর্মকোশ' নামক গ্রন্থ। বসুবন্ধু এ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন নানা বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করে বৈভাষিক নামক দার্শনিক মতবাদ স্থাপন করবার জন্য। এ গ্রন্থ বৌদ্ধ-দর্শনে একটি বিরাট স্থান অধিকার করে রয়েছে। সেই কারণে সে গ্রন্থ তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে এখনো আগ্রহের সঙ্গে অধ্যয়ন করা হয়। ভারতবর্ষ থেকে ফিরে আসবার পর হিউয়ান্-সাং অভিধর্মকোশ অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদ অবলম্বনে এই নূতন দার্শনিক মতবাদের প্রচলন হয়।

(৬) বিনয় সম্প্রদায়। তাও-স্যুয়ান নামক হিউয়ান্-সাঙের এক শিষ্য এই সম্প্রদায় স্থাপন করেন। হিউয়ান্-সাঙের অন্যান্য শিষ্যেরা বৌদ্ধদর্শনের উপর এতটা ঝোঁক দিয়েছিলেন যে বৌদ্ধভিক্ষুর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিয়মাবলীর মূল্য কমে যাচ্ছিল। বৌদ্ধ-বিনয়পিটকেই এই নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হয়েছে। তাও-স্যুয়ান সেই নিয়মাবলীর প্রয়োজনীয়-তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই এই নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন।

(৭) খৃস্টীয় অষ্টম শতকে বজ্রবোধি ও তাঁর শিষ্য অমোঘবজ্র চীন-দেশে তান্ত্রিক-বৌদ্ধধর্মের প্রচলন করেন। এই মতাবলম্বী সম্প্রদায় ছিল বজ্রযান। সেই বজ্রযান মতের তান্ত্রিক সাধনাই চীনেরা গ্রহণ করে। এই তান্ত্রিক ধর্মমত চীনদেশে কোন কোন স্থানে এবং জাপানে এখনো প্রবল।

এই সব সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা করলে বোঝা যায় যে বৌদ্ধ-ধর্ম চীনদেশে কতটা প্রসারলাভ করেছিল। ভারতীয় বৌদ্ধসমাজের প্রচলিত নানা মতবাদ চীনদেশে পৌছেছিল এবং চীনা-বৌদ্ধপণ্ডিতদের

আকৃষ্ট করেছিল। চীনদেশে সে সমস্ত মতবাদকে অঙ্গীকার করে নূতন নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলে। ফলে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে তার বিদেশী রূপ পরিহার করে চীনা রূপ গ্রহণ করে।

চীনদেশে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব

খৃস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের মধ্যেই ভারতীয় সভ্যতার বিভিন্ন ধারা প্রাচ্য-এশিয়ার নানা দেশে প্রসারলাভ করে। সমুদ্রপথে ভারতের বণিক সম্প্রদায় বহুপূর্ব থেকেই শ্যাম, ইন্দোচীন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত আরম্ভ করে। এ সমস্ত অঞ্চলের সভ্যতা সেকালে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ছিল এবং সেখানে কোনো ক্ষমতাশালী রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে মনে হয় না। এই কারণেই ভারতীয়গণ অল্পকালের মধ্যেই সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও ইন্দোচীনে উপনিবেশ স্থাপন ও শক্তিশালী হিন্দুরাজ্য গঠন করতে সমর্থ হন। গুপ্তযুগের পূর্বেই যে সব হিন্দুরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যে ইন্দোচীনে কম্বুজ ও চম্পা এবং দ্বীপময় অঞ্চলে শ্রীবিজয়রাজ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কম্বুজরাষ্ট্র বর্তমান কাম্বোডিয়া ও শ্যাম নিয়ে গঠিত হয়। চম্পারাজ্য আনাম প্রদেশের দক্ষিণাংশে এবং শ্রীবিজয় সুমাত্রার পালেম্বাং প্রদেশে অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে যবদ্বীপ ও মালয় উপদ্বীপের কতকাংশ শ্রীবিজয়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সমস্ত রাজ্যে হিন্দু-সংস্কৃতিই ছিল প্রাচীনকালে স্থানীয় সভ্যতার মূল উপাদান। যতদিন ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগসূত্র দৃঢ় ছিল, ততদিন ছিল এই সমস্ত রাজ্যের গৌরবময় যুগ। এই যুগের যে সমস্ত শিল্প-নিদর্শন আছে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় শিল্পের ধারা রক্ষা করছে। চম্পা, কম্বুজ, শ্যাম ও যবদ্বীপের প্রাচীন হিন্দু-মন্দিরগুলির মধ্যে শুধু যে হিন্দুধর্মের প্রভাবই পাওয়া যায় তা নয়। তাদের উপাদান, গঠনপদ্ধতি, মন্দিরগাত্রের প্রস্তরে কারুকর্ম, ভাস্কর্য প্রভৃতিতেও সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় শিল্পের ধারাই অনুসৃত হয়েছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগসূত্র শিথিল হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই শিল্পের অবনতি ঘটে।

স্থানীয় সভ্যতা যথেষ্ট উন্নত না হওয়ায় তা ভারতীয় সভ্যতাকে অঙ্গীভূত করে নিয়ে কোনো নূতন সংস্কৃতির সৃষ্টি করতে পারে নাই।

কিন্তু মধ্য এশিয়া ও চীনদেশে ভারতীয় কৃষ্টির যে সব ধারা পৌছয় তা স্থানীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত হয় এবং নূতন সংস্কৃতির গঠনে সহায়তা করে। তার কারণ চীনদেশের সভ্যতা ছিল অতি উন্নত ধরণের। খৃস্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই সে দেশের শিল্প ও সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে দেশের ধর্ম ও দর্শন সমস্ত দেশবাসীর মধ্যে প্রসারলাভ করেছিল। খৃস্টীয় প্রথম শতকে ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনদেশের যখন প্রথম যোগসূত্র স্থাপিত হয়, তখন চীনারা ভারতীয় সভ্যতার সেই সমস্ত ধারাই গ্রহণ করল যা তাদের অতি নূতন ও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল।

খৃস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে চীনদেশে ভারতীয় সভ্যতার ধারা পৌছয় স্থলপথে। এ পথ আফগানিস্তান, বাহ্লীক (বাল্‌খ), মধ্য এশিয়ার নানা জনপদ—কাশগড়, খোটান, কুচী প্রভৃতি হয়ে চীনদেশের উত্তরাঞ্চলে শানশি ও হোনান্‌ প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হতে ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় খৃস্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই মধ্য এশিয়ার নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। পরে বৌদ্ধভিক্ষুরা ক্রমশ সে সব দেশে যাতায়াত শুরু করেন। খৃস্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে প্রচারিত হয়। বৌদ্ধভিক্ষু ও আচার্যদের চেষ্টায় আফগানিস্তান হতে চীন পর্যন্ত সমস্ত দেশেই বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠালাভ করে। গুপ্তযুগের পূর্বেই এই সমস্ত দেশে একটি বিরাট আন্তর্জাতিক বৌদ্ধসংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্কৃতির মূল উপাদান ছিল ভারতীয় সভ্যতা। স্থানীয় সভ্যতার ধারাও তাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছিল।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের ধারাও মধ্য এশিয়ার পথে চীনদেশ পর্যন্ত পৌছেছিল। খৃস্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকেই

বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করে ভারতে একটি উন্নত ধরণের শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। এই শিল্পের দুটি প্রধান অবদান হচ্ছে স্তূপ ও চৈত্য-বিহার। চৈত্য-বিহারগুলিকে গুহা-মন্দির বললেও ভুল হয় না। কারণ এ শিল্প পর্বতগাত্রের প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম গুহা অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। একটি প্রশস্ত গুহায় চৈত্য স্থাপিত হত এবং সেই গুহায় পর্বদিনে বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা সম্মিলিত হতেন। এই চৈত্য-গুহার নিকটে পর্বতগাত্রে আরও অসংখ্য গুহা নির্মিত হত। সেই গুহাগুলি বৌদ্ধভিক্ষুদের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হত। তাঁরা সেখানে নির্জনে ধ্যান ধারণা ও অধ্যয়নে কালাতিপাত করতেন। এই ধরণের গুহা খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকেই নির্মিত হতে থাকে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গুহা দেখতে পাওয়া যায় বিহার প্রদেশে, বরাবর পর্বতে। এই গুহার নাম 'লোমশ ঋষির গুহা।' এখানেও ভিক্ষুরা বাস করতেন। পরবর্তী যুগে ভাজা, নাসিক, কার্লে, খণ্ডগিরি প্রভৃতি স্থানেও এই ধরণের গুহা-মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। এই শিল্পের চরম উন্নতি সাধিত হয় গুপ্ত যুগে। তার প্রধান নিদর্শন পাওয়া যায় অজন্তায়। প্রথম যুগের গুহাগুলির মধ্যে কোনো লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য না থাকলেও পরবর্তীকালে এইগুলিকে অবলম্বন করে নূতন নূতন শিল্প সৃষ্টি চলে—গুহার মধ্যে নানা কারুকার্য, গুহার গাত্রে চিত্রাঙ্কন, প্রস্তরে নানা মূর্তির কল্পনা। এই চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের চরম পরিণতি দেখতে পাওয়া যায় অজন্তার গুহায়। বৌদ্ধ-শিল্পের এই সমস্ত ধারাই মধ্য এশিয়া ও চীনদেশ পর্যন্ত প্রসারলাভ করে।

মধ্য এশিয়ার পথে হিন্দুকুশ পর্বতের অন্তঃপাতী বামিয়েন নামক স্থানে এই বৌদ্ধ-শিল্পের যে সব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তাতে ভারতীয় শিল্পের ধারাই অনুসৃত হয়েছে। এই স্থানে প্রাচীন যুগের গুহা-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখতে পাওয়া যায়। গুহা-মন্দিরের প্রাচীরচিত্রের কতকাংশ এখনো সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় নাই। সেই

চিত্রগুলি অজন্তার প্রাচীরচিত্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তার বিষয়বস্তু, পরিকল্পনা ও রচনাভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে অজন্তার অনুরূপ। এই সমস্ত গুহার নিকটে পর্বতগাত্রে কতকগুলি বিরাট বুদ্ধমূর্তি ক্ষোদিত হয়েছিল। এছাড়া আরও অনেক বুদ্ধমূর্তি এ অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। এ গুলিতে যে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভাস্কর্যের ধারা অনুসৃত হয়েছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ভারতীয় শিল্পের এই বিশিষ্ট ধারাকে 'ইন্দো-গ্রীক শিল্প' আখ্যা দেওয়া হয়। কারণ এর মধ্যে একটি বিশিষ্ট গ্রীকপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পাঞ্জাব প্রদেশে যে সমস্ত গ্রীক স্থায়ীভাবে বসবাস করত তাদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। খুব সম্ভব তাদের হাতেই এই নূতন শিল্পপদ্ধতি গড়ে ওঠে। এই শিল্পপদ্ধতির চরম বিকাশ হয় কুষান যুগে—খৃস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে। এই কারণেই বামিয়েন এবং মধ্য এশিয়ার নানা স্থানে এমন কি চীনের হোনান্ প্রদেশে ভাস্কর্যের এই বিশিষ্ট রচনাশৈলীর নিদর্শনই বেশী পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে, গুপ্তযুগে গ্রীকপ্রভাবমুক্ত বিশুদ্ধ ভারতীয় ধারাও যে, এসব অঞ্চলে প্রসারলাভ করেছিল তারও নানা প্রমাণ পাওয়া যায়।

খোটান ও কাশগরের নিকটবর্তী নানা স্থানে বৌদ্ধযুগের ধ্বংসস্তূপ হতে প্রাচীনকালের শিল্পের নানা নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। নানা বৌদ্ধমূর্তি, চিত্রিত পট, ভারতীয় লিপিতে লিখিত নানা পুঁথি প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ-সংস্কৃতির সাক্ষ্য দেয়। বৌদ্ধমূর্তি হতে ভারতীয় ভাস্কর্যের যে বিশিষ্ট ধারার খোঁজ পাওয়া যায় তা ইন্দো-গ্রীক। অনেক স্থলে এরূপ অনুমানও করা হয়েছে যে, অনেক মূর্তির মূল উপাদান তক্ষশীলা হতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। খোটানের নিকটবর্তী দান্দান উইলিক্ নামক স্থানে প্রাচীন যুগের কতকগুলি বৌদ্ধগুহা আছে। এই গুহা-গুলির প্রাচীরচিত্রের মধ্যে বামিয়েনের প্রাচীরচিত্রের মতই ভারতীয় ধারার খোঁজ পাওয়া যায়। চিত্রের পরিকল্পনায় দুই এক স্থানে পারসিক

প্রভাব চোখে পড়লেও মূল ভারতীয় প্রভাব অক্ষুন্ন রয়েছে। বিষয়বস্তু ও রচনানৈপুণ্য হতেই তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। এই গুহাগুলিও বৌদ্ধভিক্ষুদের নীরব সাধনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হত। প্রাচীন যুগের চীনা-পরিব্রাজকেরা এ অঞ্চলে আরও অনেক গুহা দেখেছিলেন। খৃস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে চীনা-পরিব্রাজক, হিউয়ান্ সাং খোটানের পথে স্বদেশে ফিরে যান। তিনি বলেছেন— "ইয়ারকন্দের দক্ষিণে যে উচ্চ পর্বতশ্রেণী আছে তা ঘন বনানীর দ্বারা আবৃত। এই পর্বতমালা হতে নানা স্রোতস্বতী জল বহন করে আনে। সেই সব পর্বতের ধারে বনানীর অন্তরালে কিংবা স্রোতস্বতীর নিকটবর্তী স্থানে অনেক গুহা আছে, আর সেই সব গুহা হচ্ছে বৌদ্ধ-সাধকদের নির্জনে সাধনার স্থান।" এই সব গুহার সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। এ সব গুহাও যে মধ্য এশিয়ার অন্যান্য গুহা-মন্দিরের মতোই ছিল তাতে সন্দেহ নাই।

খোটান হতে যে পথ চীনের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েছে, সেই পথের উপরে দান্দান উইলিক্ হতে আরও পূর্বদিকে মিরান নামক স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠানের অনেক ধ্বংসস্তূপ আছে। এই সমস্ত স্তূপ হতে প্রাচীন যুগের যে বৌদ্ধ-শিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে তা খোটান অঞ্চলের প্রাচীন শিল্পের সঙ্গে তুলনীয়। এই নিদর্শনগুলি দুটি বিশিষ্ট যুগের। কতকগুলি হচ্ছে গুপ্তযুগের ; অন্যগুলি পরবর্তীকালের— খৃস্টীয় অষ্টম-নবম শতকের। প্রথম যুগের নিদর্শনগুলির মধ্যে ইন্দো-গ্রীক এবং বিশুদ্ধ ভারতীয় শিল্পপদ্ধতির প্রভাব বর্তমান। পরবর্তী যুগের শিল্প চীনা ও তিব্বতী প্রভাবেই অনুপ্রাণিত।

মধ্য এশিয়ার উত্তরাঞ্চলে কুচী প্রদেশেও ভারতীয় শিল্পের প্রভাব দেখা যায়। কুচীর নিকটবর্তী কিজিল নামক স্থানে বৌদ্ধযুগের অনেক গুহা-মন্দির আছে। এই গুহা-মন্দিরগুলিকে তুর্কীভাষায় 'মিং-উই'

বলা হয়। এ কথার অর্থ হচ্ছে 'হাজার মন্দির'। স্থানে স্থানে এই সব গুহা-মন্দির যে সংখ্যায় ঠিক 'হাজার' না হলেও অনেক বেশী ছিল তাতে সন্দেহ নাই। কিজিলের গুহা-মন্দিরে প্রাচীরচিত্রের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে নানা দেশের প্রভাব বর্তমান। পারসিক, রোমক ও চীনা প্রভাব তাতে থাকলেও সে শিল্পের প্রধান অনুপ্রেরণা যে ভারতবর্ষ থেকে এসেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এ অঞ্চলে যে ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায় তা ইন্দো-গ্রীক রীতির অনুবর্তী।

ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা মধ্য এশিয়ার পথ বেয়ে মিলিত হয়েছিল চীনসীমান্তে তুন্-হোয়াং নামক স্থানে। মধ্য এশিয়া হতে যে সব পথ চীনদেশে গিয়েছে তুন্-হোয়াং তার সন্ধিস্থলে অবস্থিত। এ স্থান চীনসাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলেও চীনযাত্রী নানা বিদেশী এখানে বসবাস করত। চীনযাত্রী বৌদ্ধভিক্ষুরাও এখানে সাময়িকভাবে থাকতেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলত। এই সব কারণে তুন্-হোয়াং-এ নানা বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তুন্-হোয়াং পল্লীর নিকটে একটি ছোটো নদীর ধারে অনুচ্চ পর্বতমালা আছে। এই পর্বতের নানা গুহা বৌদ্ধভিক্ষুদের আকৃষ্ট করে। নিভৃত সাধনার এরূপ উপযুক্ত স্থান আর বেশী ছিল না। সেই কারণে গুহাগুলি ক্রমশ বৌদ্ধ-মন্দিরে পরিণত হয়। খৃস্টীয় চতুর্থ শতকেই এই কাজ আরম্ভ হয় এবং সপ্তম অষ্টম শতক পর্যন্ত চলে। অসংখ্য গুহা নির্মিত ও মূর্তি সুসজ্জিত হয়। চীনদেশে এ গুহাগুলি 'হাজার বুদ্ধের গুহা' (Caves of the thousand Buddhas) নামে পরিচিত। এত বড়ো বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠান মধ্য এশিয়া বা চীনদেশের অন্যত্র ছিল না।

বৌদ্ধ-শিল্পের ইতিহাসে এই গুহাগুলির স্থান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বহু বিভিন্ন ধারার সম্মেলনে যে কি চিত্তাকর্ষক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের সৃষ্টি হতে পারে তার নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। গুহাগুলির প্রাচীর-

চিত্রে ভারতীয়, পারসিক চীনা প্রভৃতি নানা ধারার সমন্বয় ধরা পড়ে। বুদ্ধ ও বোধিসত্ব মূর্তিগুলির বিচার করলে তার মধ্যে বিভিন্ন রচনাশৈলীর প্রভাব দেখা যায়। ইন্দো-গ্রীক ও গুপ্তযুগের বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে চীনা ও তিব্বতী প্রভাবে রচিত নানা বুদ্ধমূর্তি ও পটচিত্র পাওয়া গিয়েছে।

এই বৌদ্ধ-শিল্পের ধারাই উত্তর-চীনে শান্‌শি ও হোনান্ প্রদেশ পর্যন্ত পৌছেছিল। শান্‌শি প্রদেশে ইউন-কাং ও হোনান্ প্রদেশে লুঙ্-মেন্ নামক দুটি প্রাচীন বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠান আছে। খৃস্টীয় পঞ্চম শতকে এ অঞ্চল বিদেশী রাজাদের হস্তগত হয়। তাঁদের প্রথম রাজধানী তা-তং-ফু নামক স্থানের অতি নিকটেই ইউন-কাং অবস্থিত। বৌদ্ধভিক্ষুদের নির্দেশমতো ইউন-কাংএর পর্বতমালায় এই সময়ে বহু গুহা-মন্দির নির্মিত হয়। ভারতীয়-বৌদ্ধভিক্ষুরা এ কাজে সহায়তা করেন। পর্বত-গাত্রে বিরাট আকারের বুদ্ধমূর্তি ক্ষোদিত হয়। অনেক মূর্তি প্রায় ৬০ হতে ৭০ ফুট।

লুঙ-মেন, হোনান্ প্রদেশে চীনের প্রাচীন রাজধানী লো-ইয়াং নগরের নিকটে অবস্থিত। খৃস্টায় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে লুঙ-মেনের পর্বতমালায় নানা গুহা-মন্দির নির্মিত হয়। এ গুহাগুলিও ইউন-কাঙের গুহার ধরণের এবং প্রায় একই যুগে নির্মিত। ইউন-কাং ও লুঙ-মেনের ভাস্কর্যে দুটি বিশিষ্ট ভারতীয় ধারার প্রভাব দেখা যায়। একটি ইন্দো-গ্রীক পদ্ধতি অন্যটি গুপ্তযুগের বিশুদ্ধ ভারতীয় পদ্ধতি। সুদূর চীন পর্যন্ত পৌছেও এই দুই শিল্প তাদের বিশিষ্ট রূপ হারায় নাই। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে, ভারতীয়-বৌদ্ধভিক্ষুদের তত্ত্বাবধানে এই সব বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছিল তা ছাড়া খুব সম্ভবত ভারতীয় শিল্পীরা প্রভূত লাভের আশায় এ সব দেশে যাতায়াত করতেন, পরবর্তীকালে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পালযুগে বঙ্গদেশের অনেক শিল্পী বৌদ্ধ-

মন্দির নির্মাণের জন্য তিব্বত পর্যন্ত যেতেন। খৃস্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে অনীক নামক একজন বিখ্যাত নেপালী শিল্পী তিব্বতে যান। পরে চীনসম্রাটের আদেশে তিনি চীনের রাজধানীতে যান এবং সরকারী শিল্পবিভাগের উচ্চতম পদে উন্নীত হন। তাঁর হাতের নানা কাজ চীনা-শিল্পীদের চমৎকৃত করেছিল।

ইউন-কাং ও লুঙ-মেনে যে বৌদ্ধ-শিল্পের নিদর্শন আছে সে শিল্প চীনারা অতি শীঘ্রই নিজস্ব করে নিয়েছিল। যদিও তাদের প্রাচীন জাতীয়শিল্প ছিল, কিন্তু এই নূতন ভারতীয় ধারা অঙ্গীকার করে নিয়ে তারা সেই শিল্পের পরিপুষ্টিসাধন করেছিল। ফলে পরবর্তীকালের চীনা-ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় নূতন নূতন সৃষ্টি সম্ভব হয়। বৌদ্ধধর্মকে চীনারা বিদেশী ধর্ম বলে অগ্রাহ্য মনে করে নাই। সে ধর্ম হতে বহু প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে চীনা মনীষীরা অভিনব চিন্তধারার প্রবর্তন করেন। ভারতীয় শিল্পের ধারাকেও চীনা শিল্পীরা অগ্রাহ্য মনে করেন নি। বরং সে শিল্পের অনুপ্রেরণায় তারা যে নূতন শিল্প সৃষ্টি করল তা সমস্ত জগতকে আজও চমৎকৃত করে।

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে উত্তর-চীন হতে ভারতীয় শিল্পের এই ধারা জাপান পর্যন্ত পৌছায়। ঐ সময়ে কোরিয়া হতে বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রথম প্রচারিত হয়। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গেই জাপানের রাজধানী নারার নিকটে প্রথম বৌদ্ধবিহারের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বৌদ্ধবিহারের নাম হোরিয়ুজী, এই বিহারেই জাপানী চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। এই মন্দিরে যে চিত্রকলার নিদর্শন রয়েছে তা অজন্তার চিত্রকলার অনুরূপ। এই চিত্রকলা বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, যে সব শিল্পীদের হাতে এর সৃষ্টি হয়েছিল তারা নিখুঁত ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে পরিচিত ছিল। সেই আদর্শই হোরিয়ু-জীর চিত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সে চিত্রকলায় জাপানী হাতের

কোনো বিশিষ্ট ছাপ নাই। চিত্রবিদ্যায় এই প্রথম দীক্ষালাভ করবার অল্পকাল পরেই জাপানী শিল্পী চিত্রকলায় তার বিশিষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পেরেছিল। বিদেশী শিল্পপদ্ধতি সে নিজস্ব করে নিয়েছিল।

চীনদেশে ভারতীয় সংগীত

সুদূর প্রাচ্যে ভারতীয়-সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা প্রসারলাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করে ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প মধ্য এশিয়া, চীন ও জাপানে প্রচলিত হয়। নানা যুগে ভারতীয়-সংস্কৃতির এই সর্বতোমুখী প্রভাবে সে সব দেশে নূতন নূতন সৃষ্টি সম্ভব হয়। ভারতীয় সংগীতের ধারাও সে সব দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্তস্থলে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

মধ্য এশিয়ার নানা সুসভ্য জাতি ভারতীয় সংগীত গ্রহণ করেছিল এবং এই যোগসূত্র অবলম্বন করেই মধ্য এশিয়ার নানা যাযাবর জাতির মধ্যে প্রচলিত সংগীতও আংশিকভাবে আমাদের শাস্ত্রে স্থান পেয়েছিল। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে যে সব রাগের নাম উল্লিখিত হয়েছে তার মধ্যেই সে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'তুরস্ক-তোড়ী'র তুরস্ক বা তুর্কীদের সঙ্গে যোগ অস্বীকার করা যায় না। তুর্কীরা খৃস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের দিকেই ভারতে প্রবেশ করে। 'খম্বাজ' নামের সঙ্গে কম্বোজ নামের সম্পর্ক খুব স্পষ্ট। কম্বোজরা মূলত ছিল মধ্য এশিয়ার একটি যাযাবর জাতি ; পরে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে।

মধ্য এশিয়ার উত্তরাংশে কুচী প্রদেশেই ভারতীয় সংগীতের প্রচলন ছিল সবচেয়ে বেশী। খৃস্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের দিকেই কাশ্মীরের সঙ্গে কুচীরাজ্যের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হয়। সে দেশে কাশ্মীরের সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত হয়, সে সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্র কুচীভাষায় অনূদিত হয় এবং কাশ্মীরের অনেক বৌদ্ধ-পণ্ডিত সে দেশে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করেন।

সেদেশে ভারতীয় সংগীতের প্রচলন সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া যায় চীনা-সাহিত্যে। তার কারণ চীনারা বিদেশী সংগীতের খোঁজ রাখা প্রয়োজনীয়

বলে মনে করত। চীনা-সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান ছিল খুব উঁচুতে। কনফ্যুসীয় মতের ধর্মকর্মে সংগীতের প্রয়োজন ছিল এবং সেই কারণে সম্রাটের অধীনে থাকত একটি সরকারী অর্কেষ্ট্রা। সম্রাট মাঝে মাঝে বিদেশী গীতকারদেরও নিমন্ত্রণ করতেন। সেই সূত্রেই কুচী ও অন্যান্য দেশের সংগীত চীনদেশে এসে পৌঁছায়।

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ পাদে কুচীরাজ্য থেকে সুজীব নামক একজন গীতকার চীনদেশে যান। তিনি বীণা বাজানোতে ছিলেন দক্ষ। চীনাদের সংগীতে স্বর-সপ্তক ছিল না, চীনা সংগীত স্বর-পঞ্চক দিয়েই গঠিত হত। চীনারা সপ্তকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় লাভ করে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। সুজীব কুচীরাজ্য থেকে গিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি ঠিক সে দেশের লোক ছিলেন না। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন ভারতবর্ষের অধিবাসী আর তাঁদের পরিবারে বংশানুক্রমে সংগীতের প্রচলন ছিল। সুজীব চীনদেশে যে স্বর-সপ্তকের নাম করেছিলেন সে নামগুলি চীনা-সাহিত্য থেকে পাওয়া যায়। তার মধ্যে চারটি নাম নিঃসন্দেহে ভারতীয় সংগীতশাস্ত্র থেকে নেওয়া—যথা—ষড়জ্ (চীনা—শা-জে), সহগ্রাম (শা-হু-গিয়া-লান), পঞ্চম (পান-চেন) এবং ঋষভ (হু-লি-শে)। আর তিনটি নাম চীনাভাষায় যে রূপে পাওয়া যায় (সো-থো-লি, কি-জে, শা-লা) তার মূল কি ছিল তা ঠিক বোঝা যায় না। চীনা-লিপিকরের প্রমাদেই হয়তো নামগুলি বিকৃত হয়েছে। সে যা হক, স্বরগ্রামের যে কয়টি নাম উদ্ধার করা গিয়েছে তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে সব নাম ভারতীয় সংগীত থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছিল।

ঠিক এই যুগেই কুচীর আর একজন গীতকার চীনদেশে যান। চীনা বিবরণ থেকে জানা যায় যে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণবংশীয় আর সে বংশের নাম ছিল 'জাও'। এ নাম ঝা (-ওঝা উপাধ্যায়) নামের চীনা

রূপান্তর বলেই মনে হয়। এই গীতকারের নাম ছিল মিআও-তা—'সুপ্রকাশ' বা 'সুবোধ' ধরণের কোন সংস্কৃত নামের চীনা অনুবাদ। এই ঝা পরিবারে সংগীত বংশানুক্রমে প্রচলিত ছিল। সংগীতে মিআও-তার এমন অদ্ভুত দক্ষতা ছিল যে, তাঁর প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই ভারতীয় সংগীত চীনদেশের রাজা-রাজড়াদের আকৃষ্ট করে ফেলেছিল। ভারতীয় সংগীতের এই জনপ্রিয়তা চীনা সংগীতের পক্ষে মারাত্মক হবে মনে করে চীনসম্রাট তার প্রচলন বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় নাই। খৃস্টীয় সপ্তম শতকের প্রারম্ভে মিং-তা (বিন্দা ?) নামক কুচীর আর একজন গীতকার চীনদেশে যান। তিনিও খুব সম্ভব ঐ 'ঝা' বংশেরই গীতকার ছিলেন। চীন সম্রাট তাঁর সংগীতের দ্বারা এতদূর আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁকে দিয়ে অনেকগুলি গীত রচনা করিয়ে নিয়েছিলেন।

কুচীদেশের এইসব ভারতীয় গীতকারেরা নাকি এতদূর দক্ষ ছিলেন যে, যে কোনো সুর একবার শুনেই তা যন্ত্রে বাজিয়ে দিতে পারতেন। বর্ষার প্রারম্ভে যখন ঝর্ণার শতধারা তাদের সংগীতে দিগন্ত মুখরিত করে প্রবাহিত হত, তখন গীতকারেরা যেতেন দলে দলে পাহাড়ের ধারে, সেই সংগীত তাঁদের যন্ত্রের সাহায্যে সংগ্রহ করবার জন্য। এই করে তাঁরা তাঁদের সংগীতে নূতন নূতন সুরের সমাবেশ করতেন। এইভাবেই হয়তো আমাদের রাগ-সংগীতও রচিত হয়েছিল। 'দেশ', 'মল্লার', 'মেঘ' প্রভৃতি রাগের রচনার মূলপ্রেরণা ছিল প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পীর ঐ ধরণের যোগাযোগ।

কুচী থেকে যেসব অর্কেষ্ট্রা বা গীতকারের দল চীনদেশে যেতেন তাঁদের সঙ্গে নৃত্যপটু লোকেরাও থাকতেন। তাঁরা যে সব নাচ দেখাতেন তার দুই-একটি নামও চীনা-সাহিত্যে পাওয়া যায়—'শান্তি-নৃত্য', 'পঞ্চসিংহ-নৃত্য' ইত্যাদি। সিংহ-নৃত্যে কয়েকটি সিংহ রচনা করা হত।

প্রতিটি সিংহের রূপ দেওয়া হত বারোজন নৃত্যকার নিয়ে। এই নৃত্যে মোট ১৪০ জন নৃত্যকারের প্রয়োজন হত। এই নৃত্যকারেরাই বোধ হয় সুদূর প্রাচ্যে মুখোসের প্রবর্তন করেন। মুখোসের সাহায্যে নৃত্যাভিনয় ভারতবর্ষ থেকেই ওসব দেশে প্রচলিত হয়।

৫৮১ খৃষ্টাব্দে চীনসম্রাট বিভিন্ন দেশের অর্কেষ্ট্রাপার্টি আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। ভারতবর্ষ, কুচী, সমরকন্দ, কাশগর প্রভৃতি দেশের গীতকারেরা চীনদেশে উপনীত হন। এই ভারতীয় গীতকারদের একটি বিবরণ চীনা-ইতিহাসে পাওয়া যায়—"ভারতীয় গীতকারগণ কাল কাপড়ের টুপি পরেন, তাঁদের গায়ে সাদা সিল্কের জামা, ভায়লেট রঙের ব্রোকেডের আঁটা-পায়জামা এবং লালরঙের একটি ওভারকোট। প্রতিদলে দুজন করে নৃত্যকার। তাঁদের মাথায় চুল বেশ সাজানো-গোছানো এবং গায়ে বৌদ্ধভিক্ষুদের ধরণের একটি ঢিলাজামা। তাঁদের পায়ে দড়ির জুতা। তাঁদের যন্ত্রপাতির মধ্যে কাঁসর, তিন রকম ঢোলক (বোধহয় মৃদঙ্গ ও বাঁয়া তবলা), নলের বাঁশী (বোধহয় শানাই), বীণ-তার উপরটা কাল্পনিক জন্তুর মুখের মতো খোদাই করা, পাঁচ তারের বীণ (তানপুরা), করতাল ও শাঁখ।" এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ভারতীয় গীতকারদের সাজসজ্জা প্রায় দেড়হাজার বৎসরেও বিশেষ বদলায় নি।

ভারতীয় সংগীতের বর্ণনায় চীনা-ঐতিহাসিক বলেছেন যে, ওই সংগীতে "সাত রকমের স্বর-বিন্যাস ছিল আর ওই সাত রকমের মধ্যে একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য ছিল।" এ থেকে মনে হয় চীনা-ঐতিহাসিক ভারতীয় সংগীতের 'জাতি'র কথাই বলেছেন, ঠিক রাগের কথা নয়। যদিও সে যুগে খুব সম্ভব রাগ তার পূর্ণরূপ গ্রহণ করেনি, 'জাতি' রূপেই তা গণ্য হত। 'বৃহদ্দেশী সংগীতরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থে সাতটি শুদ্ধজাতির উল্লেখ আছে আর চীনারা বোধ হয় ওই সাতটি শুদ্ধজাতির পরিচয়ই পেয়েছিল।

চীনা-সাহিত্যে এই সংগীতের ২০টি স্বরের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু স্বরের নামগুলি যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে তা থেকে কোনো তথ্য উদ্ধার করা যায় না। দু-একটি নাম তাল বিশেষের নাম বলে মনে হয়। যেমন 'কুক্কুটের লড়াই', 'ফুলের মেলা', 'পো-কিয়া-অলের' নাচ ইত্যাদি। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে যে সব তালের উল্লেখ আছে তার মধ্যে কুক্কুট, মল্লিকামোদ, রায় বঙ্কোল প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। গীত যে এক সময়ে তালের নামেও অভিহিত হত তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া আছে।

ভারতীয় সংগীত চীন থেকে জাপানেও প্রসারলাভ করেছিল। দু-একটি প্রাচীন জাপানী-বৌদ্ধমঠে ভিক্ষুপরম্পরায় নানা স্তোত্র প্রাচীন ভারতীয় সুরে এখনো গীত হয়ে থাকে। সেগুলি সংগ্রহ করলে অন্তত দেড় হাজার বছর পূর্বে রাগের কি রূপ ছিল তার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যেতে পারে। জাপানীদের প্রাচীন সাহিত্য থেকে জানা যায় খৃস্টীয় অষ্টম শতকে বোধি নামক একজন ব্রাহ্মণ জাপানে দুই রকম ভারতীয় সুরের প্রচলন করেন। এ দুই সুরের নাম 'বোধিসত্ত্ব' ও 'বৈরো'। ঐ দুই সুরে নৃত্যের তালে ধর্ম-সংগীতই গীত হত। 'বোধিসত্ত্ব' বোধ হয় বৌদ্ধভিক্ষুদের মধ্যে প্রচলিত কোনো সুর। তার সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য জাপানীরা লিপিবদ্ধ করেনি। কিন্তু 'বৈরো' সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে—"বৈরোর মূল রচয়িতা পান্-লাং-তো (ভরত) ঋষি। যুদ্ধে যাবার পূর্বে সৈন্যেরা এ গান করে। যদি সাতবার গান করবার পরও শা-মো শব্দ থাকে তাহলে যুদ্ধে নিশ্চিত জয় হয়।" জাপানী ভাষায় নামগুলি বিকৃত হয়েছে এবং অর্থবৈষম্যও ঘটেছে। পান-লাং-তো যে ভরত নামের রূপান্তর তাতে কোনো সন্দেহ নাই। শা-মো সংস্কৃত 'সম' (হিন্দুস্থানী সোম্) শব্দের রূপান্তর। ছন্দ বা তালের বিরামস্থানের নামই সোম বা সম। কোনো রাগ সাতবার গাইবার পরও

এই বিরামস্থানে ছন্দ বজায় রেখে নির্ভুলভাবে পৌঁছুতে পারা সংগীতে একটি বিশেষ দক্ষতার সূচনা করে। বৈরো নাম সংস্কৃত ভৈরব (হিন্দুস্থানী) ভৈঁরো নামেরই রূপান্তর বলে মনে হয়।—ভৈরব হয়তো রৌদ্র-রসের প্রতীক, সেই কারণে সে রাগ যুদ্ধকালীন সংগীতে ব্যবহৃত হওয়া আশ্চর্য নয়। ভরতের সংগীতশাস্ত্রই সবচেয়ে প্রাচীন শাস্ত্র; সেই কারণে ভরত রাগস্রষ্টা। রাগসৃষ্টির এই কাহিনী ও ভৈরবরাগ, ভারতীয় ব্রাহ্মণ গীতকার খৃস্টীয় অষ্টম শতকে জাপানে প্রচার করেন। তিনি গিয়েছিলেন চীনদেশ থেকে। সুতরাং তিনি সে সংগীতের ধারা চীনদেশেও প্রচার করেছিলেন বলে অনুমান করা অসংগত নয়। ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের ইতিহাস এখনো বহু অংশে অস্পষ্ট। সে ইতিহাসের ধারা স্পষ্টভাবে বুঝতে গেলে প্রাচীন চীনা ও জাপানী-সাহিত্যে যে সব প্রাচীন উপাদান আছে তার অনুসন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজন।

চীনদেশে হিন্দু জ্ঞান-বিজ্ঞান

চীনদেশে ভারতীয়-সংস্কৃতি মুখ্যত বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করেই প্রসারলাভ করেছিল। সেই কারণে চীন-ভারত সংযোগের ইতিহাসে হিন্দুধর্মের বিশেষ স্থান নাই বললেই চলে। খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতক হতে আরম্ভ করে একাদশ শতক পর্যন্ত যত ভারতীয় পণ্ডিত চীনদেশে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বৌদ্ধ। দু-চার জন হিন্দুর নাম পাওয়া যায়, কারণ তাঁরা হিন্দু হলেও বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদে দোভাষীর কাজ করেছিলেন।

কিন্তু বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে চীনদেশে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানও প্রসারলাভ করেছিল। বিশেষত ভারতীয় আয়ুর্বেদ ও জ্যোতীষ চীনারা বিশেষ সমাদরের চোখে দেখত। আয়ুর্বেদগ্রন্থের দু-একখানি অনুবাদও চীনা-ভাষায় করা হয়েছিল। এই অনুবাদ ছাড়া ভারতীয় গাছগাছড়া ও ওষুধ-পত্রের নাম চীনা-ভৈষজ্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। চীনদেশের সম্রাটগণের ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষের বৈদ্যেরা এমন সব ওষুধপত্র জানতেন, যাতে দীর্ঘায়ু হওয়া সম্ভব ছিল। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তাঁরা ভারতীয় বৈদ্যের খোঁজে মাঝে মাঝে লোক পাঠাতেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে নারায়ণস্বামী নামক একজন হিন্দু-বৈদ্য চীনসম্রাটকে দীর্ঘায়ু করবার জন্য নানা ওষুধপত্র প্রয়োগ করেছিলেন, তার উল্লেখ আছে। সম্রাট অবশ্য দীর্ঘায়ু হন নি, বরং অকালে কালগত হন।

হিন্দু-জ্যোতিষের নানা গ্রন্থ চীনাভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ-জ্যোতিষীরাও রাজসভায় যথেষ্ট সম্মান অর্জন করেছিলেন। চীনসম্রাটরা নানা রাজকীয় কার্যের জন্য তিথি নক্ষত্রের গণনার প্রয়োজন স্বীকার করতেন। সেই কারণে তাঁরা একটি সরকারী জ্যোতিষ-কার্যালয়

রাখতেন; এই কার্যালয়ে ভারতীয় জ্যোতিষীরাও স্থান পেয়েছিলেন। খৃস্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগে চীনদেশের রাজধানীতে হিন্দু জ্যোতিষের তিনটি বিভিন্ন সম্প্রদায় কার্যরত ছিলেন। তাঁদের নাম গৌতম, কাশ্যপ ও কুমার। ৬৮৪ খৃস্টাব্দে গৌতম সম্প্রদায়ের জ্যোতিষীরা যে তিথি-পঞ্জী রচনা করেন, তা সম্রাটের আদেশে তিন বৎসর প্রচলিত ছিল। ঐ সম্প্রদায়ের সিদ্ধ নামক এক জ্যোতিষী ৭১৮ খৃস্টাব্দে আর একখানি তিথিপঞ্জী রচনা করেন। এই গ্রন্থের নাম 'নবগ্রহ সিদ্ধান্ত'। এ গ্রন্থ এখনও চীনাভাষায় সংরক্ষিত রয়েছে। প্রায় চার বৎসর ধরে এই তিথিপঞ্জীর প্রচলন ছিল।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে পাঁচখানি হিন্দু জ্যোতিষ ও গণিতের গ্রন্থ চীনাভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এ সব অনুবাদ এখন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের নাম চীনা-ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রত্যেক গ্রন্থের নামের পূর্বে 'ব্রাহ্মণশাস্ত্র' বলে উল্লেখ রয়েছে। চীনারা হিন্দুদের ব্রাহ্মণ বলেই জানত এবং সেই কারণে গ্রন্থগুলির নামকরণ করেছিল 'ব্রাহ্মণ-জ্যোতিষশাস্ত্র' 'ব্রাহ্মণ-গ্রহশাস্ত্র' 'ব্রাহ্মণ-গণিতশাস্ত্র' ইত্যাদি। এ সব গ্রন্থ অধুনালুপ্ত হলেও চীনদেশের প্রাচীন জ্যোতিষ ও গণিতে এদের স্পষ্ট প্রভাবের খোঁজ পাওয়া যায়।

গৌতম বংশীয় জ্যোতিষীরা খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে চীনদেশে গিয়েছিলেন। বারাণসীর গৌতম প্রজ্ঞারুচি নামক একজন ব্রাহ্মণ ৫১৬ খৃস্টাব্দে চীনদেশে যান। চীনা-বৌদ্ধসাহিত্যে তাঁকে গৃহী-বৌদ্ধ বলা হয়। কিন্তু অন্যত্র তাঁকে ব্রাহ্মণ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি হয় সপরিবারে চীনদেশে গিয়েছিলেন, না হয় সেখানে বিবাহ করেছিলেন। গৌতম ধর্মজ্ঞান নামক তাঁর এক পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ধর্মজ্ঞান খুব সম্ভব চীনদেশেই জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাটের আদেশে তিনি একখানি সংস্কৃতগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন; তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন

চীনসম্রাটের অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি ৫৫৭ খৃস্টাব্দে ইয়াং-সেন নামক স্থানের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এই যুগে চীনদেশে বাণিজ্য ব্যপদেশে যে বহু হিন্দু যেতেন ও বসবাস করতেন তা অনুমান করা অসংগত নয়। বৃহত্তর-ভারত অর্থাৎ যবদ্বীপ, কম্বুজ, চম্পা প্রভৃতি স্থানে বহু হিন্দু পরিবার স্থায়ীভাবে বংশানুক্রমে বাস করছিলেন। তাঁদের মধ্যেও অনেকে প্রথম গিয়েছিলেন বাণিজ্য করতে। সুতরাং চীনদেশেও ছোটো ছোটো হিন্দু-উপনিবেশ থাকা বিচিত্র নয়। আর হিন্দু বণিক সম্প্রদায় সেখানে ছিলেন বলেই বৌদ্ধভিক্ষুদের সে দেশে যাওয়া সহজসাধ্য হয়েছিল। এইরূপ ছোটো খাটো হিন্দু-উপনিবেশের চিহ্ন কিছু কিছু পাওয়া যায়।

দক্ষিণ-চীনে ছুয়ান-চৌ (Ch'uan-chou) নামক স্থানে, সমুদ্রের তীরে, খৃস্টীয় দশম-একাদশ শতকের দুইটি বিরাট প্যাগোদা আছে। ছুয়ান-চৌ শহরকে বিদেশীরা বিশেষত মার্কোপোলো 'জাইতন' (Zayton) নামে উল্লেখ করেছেন। প্যাগোদা দুইটি বহুবার সংস্কার করা হয়েছে, কিন্তু এই সংস্কার সত্ত্বেও তাদের মধ্যযুগীয় রূপ বদলায়নি। এই ধরণের বৌদ্ধমন্দির জাপানেও দেখা যায় আর জাপানীরা এই ধরণের নির্মাণ-পদ্ধতিকে বলে তেঞ্জিকুয়ো (Tenjikuyo) বা 'ভারতীয় পদ্ধতি'। চীনা ও জাপানীরা একে ভারতীয় রচনাপদ্ধতি মনে করলেও ভারতবর্ষে ঠিক এই ধরণের মন্দির এখন দেখা যায় না। নেপালে এবং দক্ষিণ-ভারতে মালাবার অঞ্চলে প্যাগোদা ধরণের মন্দির এখনো চোখে পড়ে। মূলত কাঠের ব্যবহারের উপরেই এই ধরণের রচনাপদ্ধতি বেশী নির্ভর করে। খুব সম্ভব স্থাপত্যে কাঠের ব্যবহার লুপ্ত হবার সঙ্গেই এই রচনাপদ্ধতি ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্ত হয়। সুতরাং প্রাচীন যুগে চীন দেশে এই রচনাশৈলী ভারতবর্ষ থেকেই গিয়েছিল তা মনে করা অসংগত নয়। বিশেষত যখন চীনা ও জাপানীরা তা নিজেরাই স্বীকার করছে।

জাইতনে এক সময়ে বৌদ্ধদের একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল। বহু বৌদ্ধভিক্ষু সেখানে বাস করতেন এবং ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষুদেরও সেখানে যাতায়াত ছিল। কিন্তু জাইতনে যে এক সময়ে একটি হিন্দু সম্প্রদায় বাস করত তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ঐ মন্দিরেই পাওয়া গিয়েছে। জাইতন একটি বড় বন্দর ছিল এবং নানা দেশ থেকে জাহাজ এসে সেই বন্দরে নোঙর ফেলত। ভারতবর্ষ থেকেও বহু জাহাজ মালমসলা নিয়ে ওই বন্দরে বাণিজ্য করতে যেত। ত্রয়োদশ শতকে মার্কোপোলোই লিখেছেন—

"At this city is the haven of Zayton, frequented by all ships of India which bring thither spicery and all other kinds of costly wares". সুতরাং জাইতনে একটি হিন্দু সম্প্রদায়ের বসবাস করা কিছু অসম্ভব ছিল না।

জাইতনের মন্দিরে ব্যবহৃত নানা স্তম্ভের মধ্যে একটি স্তম্ভে খোদিত হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। এই স্তম্ভের একটি চিত্র হচ্ছে কালীয়দমনের। নাগ অসংখ্য ফণাবিস্তার করে কৃষ্ণকে ঘিরে ফেলেছে। কৃষ্ণ তার উপর দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছেন। কৃষ্ণের দুধারে বিষ্ণুর প্রতীক শঙ্খ ও চক্রের চিহ্ন রয়েছে। দ্বিতীয় চিত্র হচ্ছে নরসিংহ মূর্তি, কৃষ্ণ নরসিংহ মূর্তিতে হিরণ্যকশিপুকে বধ করছেন। আর একটি চিত্র হচ্ছে শিবলিঙ্গ। ভক্তগাভী শিবলিঙ্গের উপর নিজের বাঁট থেকে দুধ দিচ্ছে আর চেটে চেটে লিঙ্গমূর্তিকে পরিষ্কার করছে। স্তম্ভের পাদদেশে অদ্ভুত জানোয়ারের মূর্তি খোদিত হয়েছিল। এই ধরণের মূর্তি সিংহলে 'পোলোন্নাবুরম্' নামক স্থানে হিন্দু-মন্দিরে দেখা যায়। জাইতনের মন্দিরপ্রাঙ্গণে আরও কয়েকটি প্রস্তর নির্মিত লিঙ্গমূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

জাইতনের বৌদ্ধ-মন্দিরের আন্যান্য খোদিত চিত্র বা স্তম্ভের সঙ্গে

এই স্তম্ভের কোনোরূপ সাদৃশ্য নাই। এ থেকে বোঝা যায় যে, কোন হিন্দু-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ থেকে এই স্তম্ভটি সংগ্রহ করা হয়েছিল। খোদিত চিত্রগুলির রচনাপদ্ধতি থেকে বেশ স্পষ্টই মনে হয় যে, তা ভারতীয় শিল্পীর রচিত। চীনা-বৌদ্ধশিল্পীর হাতের কোনো ছাপ তাতে নাই। খৃস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে খুব সম্ভব এই হিন্দু-মন্দির নির্মিত হয়েছিল আর তা নির্মাণ করেছিল দাক্ষিণাত্য থেকে শিল্পীরা গিয়ে। আর যে হিন্দু সম্প্রদায় সেখানে বাস করছিলেন, তাঁরাও ছিলেন খুব সম্ভব তামিল। তামিল দেশের হিন্দুরাই ছিলেন এ যুগে বহির্বাণিজ্যে অগ্রণী।

চীনদেশের নানা স্থানে অনুসন্ধান করলে এই ধরণের আরও বহু প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব। অল্পদিন পূর্বেও দক্ষিণ-চীনে নানা বৌদ্ধ-পুঁথিপত্রের মধ্যে একখানি সংস্কৃতপুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এ পুঁথি কোনো বৌদ্ধশাস্ত্রের পুঁথি নয়, কালিদাসের কাব্যগ্রন্থের নানা শ্লোকসংগ্রহ। মুর্খ কালিদাসের গল্পটিও ঐ পুঁথিতে আংশিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। চীনা বৌদ্ধদের মধ্যে কালিদাস বা অন্য কবির কাব্যগ্রন্থের যে পঠনপাঠন প্রচলিত ছিল তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। চীনদেশে যে সব হিন্দুরা বাস করছিলেন তাঁদের মধ্যেই এর প্রচলন ছিল বলে মনে হয়।

সুতরাং এ কথা মনে করা ভুল হবে যে প্রাচীন চীনারা শুধু বৌদ্ধ-ভারতের সঙ্গেই যোগসূত্র স্থাপন করেছিল এবং বৌদ্ধ-সংস্কৃতি ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় সংস্কৃতির খোঁজ খবর রাখত না। বৈশেষিক ও সংখ্যদর্শনের প্রামাণিক গ্রন্থের অনুবাদ চীনাভাষায় আছে। তা ছাড়া স্থাপত্য, ভাস্কর্য আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত, সঙ্গীত প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রভাবও চীনারা যথেষ্ট পরিমাণে অঙ্গীকার করে নিয়েছিল।

পরিশিষ্ট

[যে সব ভারতীয় বৌদ্ধ-পণ্ডিত চীনদেশে গিয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদ করেছিলেন তাঁদের নামের তালিকা।]

অতিগুপ্ত—ইনি মধ্য-ভারতের একজন বৌদ্ধ-পণ্ডিত। মধ্য এশিয়ার রাস্তা ধরে ৬৫২ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশের রাজধানীতে পৌছন। সেখানে ছ-নেন মঠে থেকে ৬৫৩ ও ৬৫৪ খৃস্টাব্দে মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এই কাজে তাঁকে মহাবোধির দুজন ভিক্ষু, সংঘানন্দমোক্ষ ও কাশ্যপ সাহায্য করেন। এঁরা দুজনে সেই সময় চীনদেশেই ছিলেন।

অজিতসেন—উত্তর-ভারতের বৌদ্ধ-পণ্ডিত। ইনি মধ্য এশিয়ায় চীনা সরকারের কেন্দ্র কুচীতে গিয়েছিলেন। এখানে অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইনি তিনখানি বৌদ্ধধর্মবিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদ করেন এবং অনুবাদগুলি ৭৩২ সালে চীন রাজসভায় উপস্থিত করেন।

অমোঘবজ্র—সিংহলে উত্তর-ভারতীয় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে এঁর জন্ম। দশ বৎসর বয়সে এক আত্মীয়ের সঙ্গে ইনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপনিবেশগুলিতে যান। পনেরো বৎসর বয়সে বজ্রবোধি এঁকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। পরে গুরুর সঙ্গে ইনি চীনদেশে যান। ৭২৪ খৃস্টাব্দে এঁরা দুজনে লো-ইয়াং-এ পৌছন। সেখানে কুয়াং-ফো-স মন্দিরে ৭৩১ খৃস্টাব্দ অবধি কাজ করেন। পরে গুরুর আদেশে ইনি সংস্কৃত বইয়ের খোঁজে সিংহলে ফিরে আসেন। ৭৩৬ খৃস্টাব্দে রওনা হয়ে তার পরের বৎসর ইনি সিংহলে এসে পৌছন। সিংহলের দন্তবিহারে ইনি ৭৪৬ খৃস্টাব্দ অবধি থেকে সিংহলসম্রাটের প্রেরিত দূতদের সঙ্গে চীন-দেশে প্রত্যাগমন করেন। তারপর লো-ইয়াং, হোশী, লিয়াং-চৌ প্রভৃতি বহু স্থানে ইনি কাজ করেন। ৭৭৪ খৃস্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। ইনি ছিলেন

বজ্রযান তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের। এঁর অনুবাদের ১১৯ খানি গ্রন্থ এখনও বর্তমান।

আদিসেন (?)—এঁর আর একটি নাম ছিল রত্নচিন্ত। কাশ্মীরের কোন ক্ষত্রিয় রাজকুলে এঁর জন্ম, পরে ইনি বৌদ্ধভিক্ষু হন। বিনয় বিষয়ে ইনি ছিলেন মহাপণ্ডিত। ৬৯৩ খৃস্টাব্দে ইনি লো-ইয়াং-এ পৌছন, সেখানে থিয়েন-কোয়ান মঠে ৬৯৩ থেকে ৭০৬ খৃস্টাব্দের মধ্যে সংস্কৃত সাতখানি বই অনুবাদ করেন। ইনি থিয়েন-চু বা 'ভারত-মঠ' এই নাম দিয়ে এক মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ৭২০ খৃস্টাব্দ এঁর মৃত্যু হয়।

উপশূন্য—ইনি হচ্ছেন উজ্জয়িনীর একজন বৌদ্ধভিক্ষু। ৫৩৮-৫৩৯ খৃস্টাব্দে ইনি উত্তর-চীনে যান। সম্রাটের আদেশে ৫৪৮ খৃস্টাব্দে ইনি খোটানে যান। ৫৬৫ খৃস্টাব্দে ইনি দক্ষিণ-চীনে যান। দুই রাজধানীতে মিলে ইনি ছয়খানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

ঈশ্বর—৪২৬ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশে যান। চীনাভাষায় এঁর মাত্র একখানি অনুবাদ বর্তমান।

কুমারজীব—এঁর পিতা কুচীদেশের এক রাজপুত্রীকে বিবাহ করেন। ইনি কাশ্মীরে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। পণ্ডিত হিসাবে এঁর নাম মধ্য এশিয়া ও চীনদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ৪০১ খৃস্টাব্দে ইনি চাং-আনে পৌছন এবং অনেক কাজ করে যান। বোধ হয় ৪১৩ খৃস্টাব্দে চীনদেশেই এঁর মৃত্যু হয়। এঁর চীনাভাষায় ১০৬ খানি অনুবাদ আছে।

কুমারবোধি—ইনি তুর্ফান রাজের রাজগুরু ছিলেন। ৩৮২ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশে যান। চীনাতে অনূদিত এঁর একখানি বই পাওয়া যায়।

কালযশস—ইনি অভিধর্ম বিষয়ে মহাপণ্ডিত ছিলেন। ৪২৪ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশে গিয়ে চীনাভাষায় দুইখানি গ্রন্থের অনুবাদকার্য সমাপ্ত

করেন। ষাট বৎসর বয়সে ৪৪৪ খৃস্টাব্দের কিছু পরেই ইনি চীনদেশেই দেহত্যাগ করেন।

কালরুচি—২৮১ খৃস্টাব্দে চীনাভাষায় অনূদিত এঁর একখানি বই পাওয়া যায়

কালোদক—৩৯২ খৃস্টাব্দে চীনাভাষায় এঁর অনূদিত একখানি বই পাওয়া যায়।

কাশ্যপ মাতঙ্গ—৬৫ খৃস্টাব্দে যে দুজন বৌদ্ধভিক্ষু চীনদেশে গিয়েছিলেন ইনি হচ্ছেন তাঁদেরই মধ্যে একজন। অন্যজন হচ্ছেন ধর্মরত্ন। ইনি ধর্মরত্নের সাহায্যে পাঁচখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

কেকয়—(?) চীনদেশের সান-শী প্রদেশে ওয়েই বংশের রাজধানী পেই-থাইয়ে ৪৭২ খৃস্টাব্দে ইনি পাঁচখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন.।

চেন চে—এটি হচ্ছে চীনা নাম, সংস্কৃতে বোধহয় হবে সত্যজ্ঞান (?)। ইনি মঙ্গোল রাজাদের রাজত্বকালে (১২৮০-১৩৬৮) চীনদেশে যান। এঁর অনূদিত একখানি বই চীনাভাষায় পাওয়া যায়।

চে কি সিয়াং—এটি হচ্ছে এঁর চীনা নাম। জ্ঞানশ্রী বা এই ধরনের কোনো নামের এটি চীনাভাষায় রূপান্তর। ইনি হচ্ছেন পশ্চিম-ভারতের বৌদ্ধভিক্ষু! ১০৫৩ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশে যান, সঙ্গে নিয়ে যান নানাবিধ সংস্কৃত পুঁথি। চীনাভাষায় এঁর অনূদিত দুখানি বই পাওয়া যায়।

গীতমিত্র—৩৯৭ থেকে ৪১৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইনি চীনদেশে ছিলেন। ইনি চীনাভাষায় পঁচিশখানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

গুণভদ্র—ইনি ছিলেন অভিধর্ম বিষয়ে পারদর্শী মধ্য-ভারতের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। ইনি প্রথমে যান সিংহলে। তারপর সমুদ্রপথে চীন যাত্রা করেন। ৪৩৫ খৃস্টাব্দ ইনি ক্যান্টনে পৌছন। ৪৬৮ খৃস্টাব্দে মৃত্যুর

সময় অবধি ইনি নানকিংএ ছিলেন। চীনাভাষায় এঁর অনূদিত ৭৬ খানি বই বর্ত্তমান।

গুণবর্মন—ইনি কাশ্মীর রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর ইনি প্রথমে সিংহল এবং পরে যবদ্বীপে যান। সেখানে চীনাভিক্ষুরা এঁকে চীনদেশে যেতে অনুরোধ করেন। ৪৩১ খৃস্টাব্দে ইনি নানকিং-এ পৌঁছে জেতবন-বিহারে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। সেই বৎসরেই ৬৫ বৎসর বয়সে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ইনি ১১ খানি বই অনুবাদ করেন।

গুণবৃদ্ধি—ইনি ছিলেন মধ্য ভারতের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। ৪৭৯ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশে যান এবং নানকিংএ বসবাস আরম্ভ করেন। ৫০২ খৃস্টাব্দে নানকিংএ এঁর মৃত্যু হয়। ৪৭৯ এবং ৪৯২ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইনি ৩ খানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

গুণসত্য (?)—ইনি ৪৫৪-৪৬৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে চীনদেশে যান। ৪৬২ খৃস্টাব্দে ইনি দুখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

গুপ্ত—এঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ইনি যখন চীনদেশে যান তখন থাং বংশ চীনেদেশে রাজত্ব করছেন। ৮৬৫ খৃস্টাব্দের কিছু আগে ইনি একখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

গৌতম ধর্মজ্ঞান—ইনি হচ্ছেন গৌতম প্রজ্ঞারুচির পুত্র। গৌতম প্রজ্ঞারুচিও চীনদেশে গিয়েছিলেন এবং ৫৩৮ ও ৫৪৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অনেক বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ইনি ঠিক কোন সময়ে চীনদেশে যান তা আমাদের জানা নাই। চৌ সম্রাটদের সময় ইনি ৫৫৭ থেকে ৫৮১ খৃস্টাব্দের মধ্যে প্রদেশপালের কাজ করেন। ৫৮১ খৃস্টাব্দে স্থই বংশের সম্রাটরা যখন এলেন তখন তাঁরা এঁর প্রতি ভাল ব্যবহার করেন। ৫৮২ খৃস্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে একখানি বই ইনি চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

গৌতম প্রজ্ঞারুচি—ইনি বারাণসীবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। ৫১৬ খৃস্টাব্দে ইনি লো-ইয়াং-এ পৌছন, ৫৪৩ খৃস্টাব্দ অবধি ইনি কাজ করে কুড়িখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। ইনি বোধহয় এঁর ছেলে গৌতম ধর্মজ্ঞানকে সংগে নিয়ে চীনদেশে যান।

গৌতম সংঘদেব—ইনি কাশ্মীরবাসী বৌদ্ধ-পণ্ডিত ছিলেন। অভিধর্ম-শাস্ত্র বিষয়ে এঁর গভীর জ্ঞান ছিল। ৩৮৪ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশের রাজ-ধানী চাং-আনে পৌছন। ৩৯১ খৃস্টাব্দ অবধি ইনি উত্তর-চীনে ছিলেন পরে দক্ষিণ-চীনে যান। ইনি প্রথমে যান লুশানে তারপর ৩৯৭ খৃস্টাব্দে ইনি নানকিং-এ এসে পৌছন। ইনি চীনাভাষায় আটখানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

জিনগুপ্ত—ইনি ছিলেন গন্ধাররাজ্যের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। ইনি সম্ভ্রান্তবংশীয় এবং পরে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। মধ্য এশিয়ার পথ ধরে ৫৫৭ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশে পৌছন। ৫৫৯ খৃস্টাব্দে চাং-আনে পৌছে ৫৭২ খৃস্টাব্দ অবধি কাজ করে ইনি ৪ খানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন, এর পর এঁকে রাজনৈতিক কারণে বাধ্য হয়ে চীনদেশ ছেড়ে মধ্য এশিয়ায় চলে আসতে হয়। সেখানে ৫৮২ খৃস্টাব্দ অবধি ইনি তুর্কীদের সঙ্গে বাস করেন। রাজনৈতিক গোলমাল চুকে গেলে ইনি চাং-আনে ফিরে যান। ৬০৫ খৃস্টাব্দে বা তার কিছুকাল পর মৃত্যুর সময় অবধি সেখানেই কাজ করেন। এইবার ইনি ৩৯ খানি বই অনুবাদ করেন।

জিনযশ—ইনি ছিলেন মগধের একজন বৌদ্ধভিক্ষু, ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইনি চীনদেশে যান। ৫৬৪ খৃস্টাব্দ থেকে ৫৭২ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইনি ছয় খানি বইয়ের অনুবাদ করেন।

জ্ঞানভদ্র—ইনি ছিলেন পদ্মদেশের (?) একজন বৌদ্ধভিক্ষু। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইনি চাং-আনে গিয়ে পো-কিয়া-স্ মঠে বসবাস সুরু করেন। ৫৫৮ খৃস্টাব্দে ইনি একখানি বই চীনাতে অনুবাদ করেন।

জ্ঞানভদ্র (২)—ইনি ছিলেন যবদ্বীপের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। বোধ হয় ভারতীয় বংশজাত। ইনি চীনদেশে যান নি; তবে কোন চীনা-তীর্থযাত্রীর জন্য একখানি বই ৬৬৪ খৃস্টাব্দে চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদখানি চীনদেশে নিয়ে যাওয়া হয়।

থান-ইয়াও—এঁর আসল নামটি পাওয়া যায় না। ইনি বোধ হয় একজন ভারতীয়। ওয়েই রাজাদের সান-শী প্রদেশের রাজধানীতে ইনি যান। এখানে ইনি তিনখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন এবং ৪৬০-৪৬৫ খৃস্টাব্দে তা-তোং-ফুতে এক বৌদ্ধ-মন্দিরের কাজ পরিচালনা করেন।

থিয়েন সী ছাই—আসল নাম জানা যায় না। ইনি হচ্ছেন কাশ্মীরের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। ৯৮০ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশে যান। ৯৯৯ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশেই মারা যান। ইনি আঠারোখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

দানপাল (?)—ইনি উত্তর-ভারতের উড্ডিয়ানের এক বৌদ্ধ-পণ্ডিত। ৯৮০ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশে যান এবং ১১১খানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

দিবাকর—ইনি মধ্য-ভারতের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। ৬৭৬ খৃস্টাব্দে চীনদেশে গিয়ে ৬৮৫ খৃস্টাব্দ অবধি তিনি কাজ করেন। থাই-ইউয়ান-স আর হুং-ফু-স্ এই দুই মঠে ইনি বাস করতেন। এঁর অনুদিত ১৯ খানি বই পাওয়া যায়।

দেবপ্রজ্ঞ—ইনি খুব সম্ভব একজন ভারতীয়-বৌদ্ধভিক্ষু। কিন্তু ইনি বাস করতেন খোটানে। ইনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মের ধ্যান-মতবাদী। ৬৮৯ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশে যান ও ৬৯১ খৃস্টাব্দ অবধি সেখানে কাজ করেন। চীনাভাষায় ইনি সাতখানি বই অনুবাদ করেন।

ধর্মকৃতযশ—ইনি হচ্ছেন মধ্য-ভারতের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। ইনি

সমুদ্রপথে নানকিং-এ ৪৮১ খৃস্টাব্দে গিয়ে পৌছন। ইনি ৪৮৫ খৃস্টাব্দ অবধি কাজ করেন ও একখানি বই চীনাতে অনুবাদ করেন।

ধর্মচন্দ্র—ইনি পূর্ব-ভারতীয় একজন বৌদ্ধভিক্ষু। ইনি হয়তো কিছুকাল নালন্দায় কাটান। ইনি মধ্য এশিয়ায় কুচীতে যান। তারপর সেখান থেকে ৭৩২ খৃস্টাব্দে চাং-আনে সম্রাট সকাশে যান। ৭৩৯ খৃস্টাব্দ অবধি ইনি চীনদেশে অবস্থান করেন তারপর দেশে ফেরবার পথে খোটানে অসুস্থ হয়ে ৭৪৩ খৃস্টাব্দে মারা যান। চীনাভাষায় অনুবাদ করা এঁর একখানি মাত্র বই বর্তমান।

ধর্মদেব—ইনি নালন্দার একজন বৌদ্ধভিক্ষু। ৯৭৩ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশে যান। ১০০১ খৃস্টাব্দে মৃত্যুর সময় অবধি ইনি চীনদেশে অবস্থান করেন এবং ১১৮ খানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

ধর্মধী (?)—৩৫৭ খৃস্টাব্দ থেকে ৩৮৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইনি চীনদেশে যান এবং অন্যান্য বৌদ্ধভিক্ষুদের সাহায্যে তিনখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

ধর্মগুপ্ত—ইনি পশ্চিম-ভারতের লাটরাজ্যবাসী ছিলেন। ইনি কনৌজে শিক্ষালাভ করেন। পরে কিছুকাল ইনি টক্ক ও কপিশরাজ্যে কাটান ও পরে মধ্য এশিয়ার পথ ধরে চীনদেশের দিকে যাত্রা করেন। ৫৯০ খৃস্টাব্দে ইনি চাং-আনে এসে পৌছন। ৬১৯ খৃস্টাব্দে লো-ইয়াং-এ এঁর মৃত্যু হয়। ইনি চীনাভাষায় দশখানি বই অনুবাদ করেন।

ধর্মকাল—মধ্যভারতে কোন উচ্চবংশে এঁর জন্ম। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর ইনি অভিধর্ম শাস্ত্র বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ২২২ খৃস্টাব্দে ইনি লো-ইয়াং-এ এসে পৌছন এবং মৃত্যুকাল অবধি চীনদেশেই থাকেন। ২৫০ খৃস্টাব্দের কিছু পরেই এঁর মৃত্যু হয়। ইনি বিনয় সম্বন্ধীয় মহাসাংঘিক-প্রাতিমোক্ষ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

ধর্মমতি—ফা-হিয়েন এঁকে নিমন্ত্রণ করে নান্‌কিং-এর ওয়া-কুয়ান-স

মঠে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে ইনি দুখানি বই ৪৭৫ খৃস্টাব্দে অনুবাদ করেন।

ধর্মমিত্র—ইনি ছিলেন কাশ্মীরের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। ইনি প্রথমে মধ্য এশিয়ার নানা স্থানে ভ্রমণ করে বেড়ান এবং তারপরে ৪২৪ খৃস্টাব্দে চীনদেশে যান। ইনি নানকিং-এ জেতবনবিহারে বাস করতেন। পরে উত্তর-চীনে যাওয়ার পর ৪৪২ খৃস্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। দক্ষিণ-চীনে থাকার সময় ইনি ১২খানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

ধর্মনন্দী—ইনি ছিলেন তুখারদেশের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। কিন্তু বোধহয় কোন ভারতীয় বংশে জন্ম। ৩৮৪ খৃস্টাব্দে ইনি চাং-আনে যান এবং পাঁচখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

ধর্মপ্রিয়—ইনি প্রথমে চাং-আনে ছিলেন। সেখানে ৩৮২ খৃস্টাব্দে ইনি একখানি বই অনুবাদ করেন। পরে নানকিং-এ গিয়ে ৪০০ খৃস্টাব্দে ইনি আর একখানি বই অনুবাদ করেন।

ধর্মযশ—ইনি ছিলেন কাশ্মীরের একজন বৌদ্ধভিক্ষু এবং এঁর গুরু ছিলেন পূণ্যত্রাতা। পূণ্যত্রাতাও চীনদেশে যান। ধর্মযশ ৩৯৭-৪০১ খৃস্টাব্দের মধ্যে চীনদেশে যান। ৪০৫-৪১৪খৃস্টাব্দে ইনি ছিলেন চাং-আনে। এখানে ইনি তিনখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। বোধহয় ৪২৪ খৃস্টাব্দের পর ইনি কাশ্মীরে ফিরে যান।

ধর্মরক্ষা—ইনি ছিলেন ভারতীয় এবং শক বংশোদ্ভূত। তুন-হোয়াং-এ এঁর জন্ম হয়। ইনি প্রথমে মধ্য এশিয়ার নানা স্থানের ভাষা এবং বৌদ্ধ সাহিত্য আলোচনা করে বেড়ান। ইনি প্রথমে তুন-হোয়াং-এ থেকে অনেকগুলি অনুবাদ করেন পরে চাং-আনে গিয়ে ২৮৪ খৃস্টাব্দ থেকে ৩১৩ খৃস্টাব্দ অবধি কাজ করেন। ইনি সবশুদ্ধ ২১১ খানি বই অনুবাদ করেন।

ধর্মরক্ষ (২)—ইনি হচ্ছেন মগধের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। খুব সম্ভবত ইনি নালন্দায় ছিলেন। ১০০৪ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশে যান, সঙ্গে নিয়ে যান অনেক সংস্কৃত পুঁথি। ১০৫৮ খৃস্টাব্দে এঁর চীনদেশেই মৃত্যু হয়। এঁর অনূদিত বারোখানি বই পাওয়া যায়।

ধর্মরুচি—ইনি ছিলেন দক্ষিণ-ভারতীয় একজন বৌদ্ধভিক্ষু। ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইনি লো-ইয়াং-এ এসে পৌছন এবং ৫০১ খৃস্টাব্দ থেকে ৫০৭ খৃস্টাব্দের মধ্যে তিনখানি বই চীনাতে অনুবাদ করেন।

ধর্মরত্ন (?)—ইনি ৩৮১ থেকে ৩৯৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে ১১০ খানি বই অনুবাদ করেন। তার মধ্যে মাত্র ২৯খানি পাওয়া যায়।

ধর্মরত্ন (?)—ইনি হচ্ছেন চীনগামী প্রথম দুইজন ভারতীয় বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের মধ্যে একজন। ৬৭ খৃস্টাব্দে ইনি বোধহয় লো-ইয়াং-এ এসে পৌছন এবং কাশ্যপ মাতঙ্গের সাহায্যে ৬খানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। লো-ইয়াংএই এঁর মৃত্যু হয়।

ধর্মবোধি—পূর্ব ওয়েই রাজাদের সময় (৫৩৪-৫৫০ খৃঃ) ইনি রাজধানী থেকে একখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

ধর্মসেন—ইনি থাং রাজাদের সময় একখানি বই অনুবাদ করেন। এঁর বিষয় আর কিছু জানা যায় না।

ধ্যানভদ্র—ইনি মধ্য-ভারতের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। ইনি প্রথমে চীনদেশে যান। চীন থেকে ১৩২৬ খৃস্টাব্দে যান কোরিয়ায়, সেখানেই বোধহয় ১৩৬৩ খৃস্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। ইনি দুখানি বই অনুবাদ করেন।

নন্দী—ইনি একজন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভিক্ষু। চীনদেশে গিয়ে ৪১৯ খৃস্টাব্দে তিনখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

নন্দী (২)—এঁর আর একটি নাম হচ্ছে পূণ্যমোদয়। ইনি হচ্ছেন মধ্য-ভারতের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। অল্প বয়সে দেশ ছেড়ে ইনি প্রথমে তোখারিস্তান ও পরে সিংহলে যান। সমুদ্রপথে চীন যাত্রা করে ৬৫৫

খৃস্টাব্দে চীনের রাজধানীতে এসে পৌছন, সঙ্গে নিয়ে আসেন অনেক সংস্কৃত পুঁথি। ৬৫৬ খৃস্টাব্দে সম্রাটের আদেশে আয়ুর্ব্বেদের গাছগাছড়া সংগ্রহের জন্য দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে গমন করেন। ৬৬৩ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশে ফিরে আসেন এবং তিনখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

নরেন্দ্রযশ—ইনি ছিলেন উত্তর ভারতের উড্ডিয়ানের একজন বৌদ্ধ-ভিক্ষু। ভারতবর্ষ ছেড়ে ইনি মধ্য এশিয়ার নানা দেশে ঘুরে ৫৫৬খৃস্টাব্দে চীনদেশে উপস্থিত হন। ৫৫৬ থেকে ৫৬৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইনি সাতখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন এবং ৫৮২ থেকে ৫৮৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে আটখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। ৫৮৯খৃস্টাব্দে চীনদেশেই এঁর মৃত্যু হয়।

নারায়ণ—পশ্চিম চীন বংশের সময় (২৫৬-৩১৬ খৃঃ) ইনি চাং-আনে একখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

পরমার্থ—ইনি ছিলেন উজ্জয়িনীর একজন বৌদ্ধভিক্ষু, এঁর আর একটি নাম হচ্ছে গুণরত্ন। ইনি সমুদ্রপথে ৫৪৬খৃস্টাব্দে চীনদেশে পৌছন। ৫৪৮ খৃস্টাব্দে ইনি নানকিং-এ আসেন। ইনি ৭০ খানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। ৫৬৩ খৃস্টাব্দে ইনি ভারতে ফিরে আসবার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না। একাত্তর বছর বয়সে চীনদেশে ৫৬৯ খৃস্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।

পরামিতি (?)—ইনি সমুদ্রপথে ৭০৫ খৃস্টাব্দে ক্যান্টনে পৌছন। সেই বছরেই ইনি একখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। এই কাজে ইনি মেঘশিখ নামক বৌদ্ধভিক্ষুর কাছে সাহায্য পান। মেঘশিখ ছিলেন উড্ডীয়ানের একজন বৌদ্ধভিক্ষু।

পি-তি-মোতো—ইনি চীন বংশের সময় (৩৮৪-৪১৭ খৃস্টাব্দে) একখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

পূণ্যত্রাতা—ইনি ছিলেন কাশ্মীরের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। পঞ্চম

শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি চীনদেশে যান এবং ৪০৪ খৃস্টাব্দে একখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

প্রগুনবিশ্বাস—ইনি বুদ্ধগয়ার বজ্রাসনের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। ইনি চীনাভাষায় একখানি বই অনুবাদ করেন।

প্রভাকরমিত্র—ইনি মধ্য-ভারতের এক অভিজাত বংশের ছেলে। অল্প বয়সে ইনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ইনি নালন্দায় শিক্ষালাভ করেন ও পরে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময় এঁর খ্যাতি চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে। পরে কয়েক জন ছাত্রের সঙ্গে বুদ্ধের বাণী বিদেশে প্রচারার্থে ইনি বেড়িয়ে পড়েন। ইনি তিব্বত (?) ও মধ্য এশিয়ায় যান। ৬২৭ খৃস্টাব্দে ইনি চাং-আনে পৌছন। ইনি তিনখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। ৬৩৩ খৃস্টাব্দে উনোসত্তর বছর বয়সে চীনদেশেই এঁর মৃত্যু হয়।

প্রাজ্ঞ—ইনি ছিলেন কপিশার একজন বৌদ্ধভিক্ষু। কাশ্মীরে বৌদ্ধ সাহিত্যে ইনি শিক্ষালাভ করেন। কিছুকাল ইনি নালন্দাতেও ছিলেন। সমুদ্রপথে ৭৮১ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশে পৌছন। পরে উত্তরে গিয়ে ৮১০ খৃস্টাব্দে চাং-আনে বসবাস সুরু করেন। ইনি চীনাভাষায় আটখানি বই অনুবাদ করেছেন।

প্রজ্ঞাবল—ইনি ছিলেন কাশ্মীরের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। খুব সম্ভবত থাং রাজাদের সময় ইনি একখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

প্রজ্ঞাচক্র—ইনি ৮৪৭ থেকে ৮৬০ খৃস্টাব্দের মধ্যে চারখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

ভগবৎধর্ম (?)—ইনি হচ্ছেন পশ্চিম-ভারতের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। থাং রাজাদের সময় ইনি একখানি বই চীনাতে অনুবাদ করেন।

মন্দ্রসেন—৫০৩ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশে যান এবং তিনখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

মহাযান—ইনি ৪৮৩ থেকে ৪৯৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে দুখানি বই চীনা-ভাষায় অনুবাদ করেন।

মিত্রসম (?)—৭০৫ খৃস্টাব্দে ইনি একখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

মৈত্রেয়ভদ্র—ইনি ছিলেন মগধের একজন বৌদ্বভিক্ষু। ইনি ছিলেন খিতান সম্রাটের রাজগুরু (৯১১—১১২৫খৃঃ)। খুব সম্ভবত একাদশ খৃস্টাব্দের শেষদিকে ইনি পাঁচখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

মোক্ষল—ইনি বোধহয় একজন ভারতীয়-ভিক্ষু। তৃতীয় শতাব্দীর শেষদিকে ইনি চীনে যান। ২৯১ খৃস্টাব্দে ইনি একখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

যশোগুপ্ত—ইনি বোধহয় একজন ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষু। ৫৬১ থেকে ৫৭৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইনি চীনদেশে যান। ইনি ছিলেন জিনযশার একজন সাহায্যকারী, ইনি চীনাভাষায় তিনখানি বই অনুবাদ করেন।

রত্নমতি—৫০৮ খৃস্টাব্দে ইনি লো-ইয়াং-এ যান এবং বোধিরুচি এবং বুদ্ধ-শান্তের সাহায্যে আটখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

লিউ-ইয়েন—এঁর ভারতীয় নাম বোধহয় ছিল বিনয়তপ (?) ইনি বোধহয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে চীনদেশে যান। ২৩০ খৃস্টাব্দে ইনি চারখানি বই চীনাতে অনুবাদ করেন।

লি-উ-ছান—ইনি উত্তর-ভারতের লম্পাক দেশের ব্রাহ্মণ ছিলেন। এঁর ভারতীয় নাম বোধহয় ছিল রোমোদন। ইনি হয়তো ৭০০ খৃস্টাব্দে বা কিছু আগে চীনদেশে গিয়েছিলেন। ওই বছরেই ইনি একখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

লোকক্ষেম—ইনি ছিলেন একজন শক বংশীয় ভারতীয়-বৌদ্ধভিক্ষু। ১৪৮ খৃস্টাব্দের কিছু পরেই ইনি লো-ইয়াংএ যান। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ধে ইনি ২৩ খানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

বজ্রবোধি—ইনি প্রথমে কাঞ্চীরাজের গুরু ছিলেন। ইনি নালন্দায় শিক্ষালাভ করেন। ইনি প্রথমে সিংহলে এবং পরে ৭১০ খৃস্টাব্দে চীনদেশে যান। ৭৩২ খৃস্টাব্দে মৃত্যুর সময় অবধি ইনি চীনদেশেই ছিলেন। ইনি তান্ত্রিক মতের বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে চীনদেশে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি এগারোখানি বই অনুবাদ করেন।

বিঘ্ন—২২৪ খৃস্টাব্দে ইনি চীন রাজধানীতে আসেন। ইনি চীনাভাষায় দুখানি বই অনুবাদ করেন।

বিনীতরুচি—ইনি ছিলেন উড্ডিয়ানের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। ৫৮২ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশের রাজধানীতে পৌছন এবং চীনাভাষায় দুইখানি বইয়ের অনুবাদ করেন।

বিমলাক্ষ—ইনি ছিলেন কাশ্মীরের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে মধ্য এশিয়ার পথ ধরে ইনি চীনদেশে গিয়ে পৌছন। কুমারজীবের বহু কাজে ইনি সাহায্য করেন। কুমারজীবের মৃত্যুর পর ইনি দক্ষিণ-চীনে গিয়ে মারা যান। চীনাভাষায় ইনি দুখানি অনুবাদ করেন।

বিমোক্ষসেন—ইনি ছিলেন শাক্যবংশীয় ও উড্ডিয়ানের রাজপুত্র। গৌতম প্রজ্ঞারুচির সংগে ইনি চীনদেশে যান এবং ৫৪১ খৃস্টাব্দে একখানি অনুবাদ করেন।

বুদ্ধজীব—ইনি কাশ্মীরে বিনয়ের শিক্ষক ছিলেন এবং মহীশাসকপন্থী ছিলেন। ৪২৩-৪২৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইনি মহীশাসক-সম্প্রদায়ের তিনখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

বুদ্ধত্রাত—ইনি ছিলেন কপিশার একজন বৌদ্ধভিক্ষু। খুব সম্ভবত সপ্তম খৃস্টাব্দের শেষের দিকে ইনি চীনদেশে যান। ইনি লো-ইয়াংএর পো-মা-স মঠে থাকতেন। চীনাভাষায় এঁর অনূদিত একখানি বই পাওয়া যায়।

বুদ্ধপাল—ইনি কপিশ-নিবাসী এক বৌদ্ধভিক্ষু। ইনি শুনেছিলেন যে উত্তর-চীনের উ-তাই পাহাড়ে মঞ্জুশ্রী থাকেন, তাই ইনি তীর্থযাত্রা করেন ও ৬৭৬ খৃস্টাব্দে এই পাহাড়ে এসে পৌঁছন। পরে ইনি লো-ইয়াং-এ আসেন এবং সেখানে সিং-মিং মঠে থাকার সময় একখানি বইয়ের চীনা অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ ৬৮৩ খৃস্টাব্দে করা হয়। পরে ইনি উ-তাই পাহাড়ে যান, সেখান থেকে আর তিনি ফিরে আসেন নি।

বুদ্ধভদ্র—ইনি কপিলবস্তুর শাক্যবংশজাত। এঁর পরিবারের সকলে বোধহয় বহুদিন হতে নগরহারে বসবাস করতেন। ইনি কাশ্মীরে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ফা-হিয়েনের সঙ্গে চে-ইয়েন ভারতবর্ষে আসেন। ইনি এই চে-ইয়েনের সঙ্গে পঞ্চম খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে দক্ষিণ-চীনে গিয়ে উপস্থিত হন। ইনি বেশীর ভাগ সময়ই নানকিং-এ অতিবাহিত করেন। তবে হুই-ইউয়ানের নিমন্ত্রণে ইনি কিছুদিন লুশানেও ছিলেন। ৪২৯ খৃস্টব্দে ইনি চীনদেশেই মারা যান। ইনি ১৫খানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে ৫০ পরিচ্ছেদের অবতংশকসূত্রের অনুবাদ।

বুদ্ধবর্মন—ইনি বোধহয় কাশ্মীর নিবাসী ছিলেন। বিভাষা দর্শনে ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ৪৩৩ খৃস্টাব্দের কিছু পূর্বে ইনি পশ্চিম-চীনে যান। ৪৩৭-৪৩৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে ৬০ পরিচ্ছেদের মহাবিভাষা শাস্ত্র ইনি চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

বুদ্ধশান্ত—ইনি উত্তর-ভারতের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। ৫২০ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশে আসেন। ইনি লো-ইয়াংএর পো-মা-স মঠে প্রথমে বাস করেন, পরে তিনি ইয়ে শহরে চিন-হুয়া মঠে বাস করতেন। ৫৩৯ খৃস্টাব্দ অবধি ইনি চীনদেশে ছিলেন। চীনাভাষায় এঁর অনূদিত ৯ খানি বই পাওয়া যায়।

বুদ্ধযশ—ইনি ছিলেন কাশ্মীরের এক ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে। ১৩ বৎসর বয়সে ইনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। ২৭ বৎসর বয়সে দেশ ছেড়ে মধ্য এশিয়ায় বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের জন্য ইনি বেরিয়ে পড়েন। চাং-আন থেকে কুমারজীবের নিমন্ত্রণ পেয়ে ইনি সেখানে যান। ইনি চীনাভাষায় চারখানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তার মধ্যে দীর্ঘাগম এবং ধর্মগুপ্তক বিনয় ৪১০ থেকে ৪১৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে অনুবাদ করা হয়। পরে ইনি কাশ্মীরে ফিরে আসেন।

বোধিরুচি—ইনি ছিলেন উত্তর ভারতের একজন বৌদ্ধশিক্ষক। মধ্য-এশিয়ার পথ ধরে ৫০৮ খৃস্টাব্দে ইনি লো-ইয়াং-এ এসে পৌছন। সংস্কৃতজ্ঞ সাতশো বৌদ্ধভিক্ষুদের পরিচালনার ভার ইনি গ্রহণ করেন। ৫১৬ খৃস্টাব্দে ইয়ং-নিং-স নামে বিখ্যাত মঠ নির্মাণ হলে বোধিরুচি সেখানে যান ও ৫৩৪ খৃস্টাব্দ অবধি কাজ করেন। তারপর নূতন রাজধানী ইয়েতে গিয়ে ৫৩৬ খৃস্টাব্দ অবধি কাজে ব্যস্ত থাকেন। ৩৯খানি বই তিনি চীনা-ভাষায় অনুবাদ করেন।

বোধিরুচি (২)—দক্ষিণ-ভারতের এক ব্রাহ্মণপরিবারে এঁর জন্ম। মহাযান বৌদ্ধধর্মাবলম্বী যশোঘোষ নামে এক বৌদ্ধভিক্ষু এঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন। ৬৯২ খৃস্টাব্দে চালুক্যরাজ চীনদেশে এক বৌদ্ধভিক্ষুদের দল পাঠান, ইনি খুব সম্ভবত সেই দলের সঙ্গে চীনদেশে যান। সমুদ্র পথে ৬৯৩ খৃস্টাব্দে ইনি চীনে পৌছন। ইনি চীনদেশের উত্তর ও দক্ষিণ, দুই প্রদেশেই বাস করেন এবং চীন সম্রাট এঁকে বিশেষ সম্মানিত করেন। বৃদ্ধাবস্থায় ৭২৭ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশে মারা যান। ইনি ভীষণ পরিশ্রম করে ৫৩খানি বই অনুবাদ করেন। তন্মধ্যে একখানি গ্রন্থ, মহারত্ন কুটস্থত্রেরই ১২০টি পরিচ্ছেদ এঁকে অনুবাদ করতে হয়। এঁর কাজে চীনা-প্রবাসী ভারতীয় পণ্ডিতরাও সাহায্য করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বৌদ্ধভিক্ষু চন্দ, ব্রাহ্মণ লিউ-ছান (রোমোদন), পূর্বভারতীয়

রাজকুমার ঈশ্বর, উত্তর-ভারতের বৌদ্ধভিক্ষু ধর্ম এবং দক্ষিণ-ভারতের প্রজ্ঞাগুপ্ত।

বোধিবর্দ্ধন (?)—ইনি সুই রাজাদের রাজত্বকালে খুব সম্ভবত সমুদ্র-পথে ভারত থেকে দক্ষিণ-চীনে এসে পৌছন। ৫৯৩ খৃস্টাব্দে ইনি কোয়াংচৌ-এ ছিলেন। এঁর অনূদিত কেবলমাত্র একখানি বই চীনাভাষায় পাওয়া যায়।

বোধিসেন—ইনি খুব সম্ভবত ভারত থেকেই চীনদেশে যান। ৮২৫ খৃস্টাব্দে ইনি মাত্র একখানি বই চীনাভাষায় রূপান্তর করেন।

সংঘভদ্র—ইনি ছিলেন বিনয়ে সুপণ্ডিত। সমুদ্রপথে ইনি চীনদেশে যান। এবং ৪৮৮ খৃস্টাব্দে একখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

সংঘভর—ইনি হিন্দুরাজ্য কম্বুজের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। অভিধর্ম শাস্ত্রে এঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ায় ইনি চীনদেশে যান এবং এগারোখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। ৬৫ বছর বয়সে ৫২৪ খৃস্টাব্দে চীনদেশেই এঁর মৃত্যু হয়।

সংঘভূতি—ইনি ছিলেন কাশ্মীরের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। ৩৮১ খৃস্টাব্দে ইনি চীনদেশে যান এবং ৩৮৩ খৃস্টাব্দে তিনখানি বই চীনা-ভাষায় অনুবাদ করেন।

সংঘবর্মন—ইনি ৪৩৩ খৃস্টাব্দে চীনদেশে যান। ৪৩৩ থেকে ৪৩৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইনি পাঁচখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

সুভূতি—৫৫৭ থেকে ৫৫৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইনি একখানি বই চীনা-ভাষায় অনুবাদ করেন।

সূর্য্যকীর্তি—সুং সম্রাটদের সময় ইনি সাতখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

সুবর্ণকূট (?)—থাং সম্রাটদের রাজত্বকালে ইনি একখানি বই অনুবাদ করেন।

শবর (?)—থাং রাজাদের সময় ইনি একখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

শুভাকরসিংহ—ইনি শাক্যবংশের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। মধ্য এশিয়ার রাস্তা দিয়ে ৭১৬ খৃস্টাব্দে ইনি চাং-আনে গিয়ে পৌছন। ৭১৬ থেকে ৭২৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইনি পাঁচখানি বই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। ৯৯ বছর বয়সে ৭৪০ খৃস্টাব্দে এঁর চীনদেশেই মৃত্যু হয়।
